জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-২৭

ইসলাম ও সেকিউল্যারিজম

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

ইসলাম ও সেক্যুউলারিজম

মূল

ডা. জাকির নায়েক

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
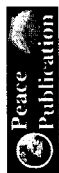
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান হতে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি

* হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি ঘোষণা দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশ্য মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতেই হবে। আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করেছি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ স্বত্তেও তা জালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮১-৮২)

* সে (হযরত মুসা (আ)) বললেন, হে আমার মালিক তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা – ২৫-২৮)

আমি আপনাদেরকে ইসলামের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সালামের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও দয়া এবং করুণা বর্ষিত হোক।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে– ইসলাম ও সেক্যুলারিজম: সহিষ্ণুতা অথবা অসহিষ্ণুতা–

ধর্ম ও সেক্যুলারিজম একটা একটার বিরোধী ধারণা। Oxford Dictionary অনুযায়ী ধর্মের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অতি প্রাকৃতিক শক্তির উপর শর্তহীন আস্থা ও বিশ্বাস। আল্লাহ্ বিরোধী সব ধরনের ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। অন্যদিকে সেক্যুলারিজমের অর্থ অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী হচ্ছে শুধু বৈষয়িক বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে যা সম্পৃক্ত। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে– এটা ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন থাকবে। এর দ্বারা আরও বুঝায় যে, ইহা ধর্মীয় বিষয়সমূহের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক থাকবে ধর্ম থেকে। আর এটার মৌলিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, এটা হবে নন মনাস্টিক (Non Monastic) অর্থাৎ মসজিদ, মন্দির উপাসনালয়ের সাথে কোন ধরনের Relation থাকবে না।

আবার ইসলাম (اسلام) যা সালাম (سلام) ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ শান্তি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা আকাংখাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়ে শান্তি অর্জন করা।

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

অর্থ : "আল্লাহর দৃষ্টিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতির নাম। এটা সম্পূর্ণ জীবনাচরণের সমষ্টি মাত্র। এর দুটো দিক আছে। প্রথমত: আধ্যাত্মিক দ্বিতীয়ত: শারীরিক। আধ্যাত্মিক দিক ও শারীরিক দিক অর্থাৎ দুনিয়াবী দিকের সুন্দর ও অসাধারণ সমন্বয় হচ্ছে ইসলাম।

এ পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব ধর্মই– হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বিশেষত ক্যাথলিক চার্চ সকলেই একথা বলে যে, তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট উৎসর্গ করতে হবে, পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে হবে, তোমাকে সন্ন্যাসীর মত কৌমার্য জীবন-যাপন করতে হবে।

একথার অর্থ হচ্ছে আপনার পিতামাতা দুনিয়া পরিত্যাগ করেননি বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ তারা ধার্মিক ছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে বর্তমানে অস্তিত্ববান। যদি তারা ধার্মিক না হতেন তবে আপনাদের পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিলো অকল্পনীয়।

ধরুন, প্রত্যেক মানুষ যারা এই ধর্মগুলোর সাথে একমত পোষণ করেন তারা স্বীকার করবেন যে, আমাদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্যে বিলীন হয়ে যেতে হবে এবং তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের পৃথিবীর কাজকর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। তবে ১০০ থেকে ১২০ বছরের মধ্যে পৃথিবী মানবশূণ্য হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে মহানবী ﷺ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসব্রতের স্থান নেই। সহীহ বুখারীর নিকাহ অধ্যায়ের চার নং হাদীসে বলা হয়েছে– "হে যুব সমাজ; তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। আর যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে।"

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি বিবাহ করলো সে যেন তার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করলো।" এখন কেউ যদি বলে যে, আমি দুটো বিয়ে করলে। তো আমার পুরো দ্বীন পালন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আসলে নবী করীম ﷺ এই অর্থে হাদীসটি বলেনটি বরং তিনি বলেছেন যে, যে বিবাহ করবে সে পরকীয়া, ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি অপরাধমূলক শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে; যা আসলেই সমাজ জীবনের অর্ধেক।

একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী স্ত্রী হওয়া যায়, শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই পিতামাতার স্বীকৃতি লাভ সম্ভব। যা ইসলামের দৃষ্টিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং একবার দুইবার বিয়ের মাধ্যমেই দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হতে পারে। ইসলাম আত্মা ও শরীর উভয়ের জন্য নিয়মনীতি প্রদান করে থাকে। কিছু লোক বলে থাকে যে, আমি দুনিয়াদারীর অনেক কাজ করে বহু পাপ করেছি এখন ধর্মের কিছু কাজ করতে চাই।

আমাদের এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের অংশ। অর্থাৎ একজনকে ভাল মুসলিম হতে হলে অবশ্যই তাকে দুনিয়ার কাজে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ ব্যতীত একজন মুসলমান কখনোই ভাল মুসলিম হতে পারে না।

সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ -

অর্থাৎ "নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না।"

এর অর্থ হচ্ছে দ্বীনের এক অংশ পালন করে অন্য অংশকে কখনোই অবহেলা করো না বরং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করো অর্থাৎ পূর্ণরূপে দ্বীনকে পালন করো।

ইসলাম সর্বাধিক সেক্যুলার ধর্ম। অক্সফোর্ড ডিকশনারীর বক্তব্য অনুযায়ী সেক্যুলার অর্থ হচ্ছে যা সন্ন্যাসবাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর এটা সত্য যে, ইসলাম সন্ন্যাসবাদকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। সেক্যুলারিজমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে– এমন মতবাদ যা পার্থিব বিষয়সমূহের সাথে জড়িত। ইসলাম বলে, আপনি যদি একজন মুসলিম হতে চান তবে অবশ্যই আপনাকে দুনিয়ার কাজে জড়িত হতে হবে। এই অর্থে ইসলাম অবশ্যই সেক্যুলারিজম।

কিছু মানুষ বলে, সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করা। সেক্যুলারিজমের অর্থ সম্প্রীতির সাথে বসবাস করা হলে তার অর্থ কখনো এই নয় যে, আপনি মুনাফিকে পরিণত হবেন। যেমন– অনেক মানুষ বলে থাকে রাম হচ্ছে গড, রাহমান হচ্ছে রাম, রাম হচ্ছেন আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। বিশেষত রাজনীতিবিদগণ এমনটি বলে থাকেন।

আমি এটাকে সেক্যুলারিজম বলি না বরং আমি বলি এটা হচ্ছে মুনাফিকী। সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার প্রকৃত অর্থ কী তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি পরিষ্কার করতে চাই। যেমন– ধরুন, দুজন শিক্ষকের মধ্যে একজন বলছে ২+২ = ৪ অন্যজন বলছে ২+২=৫

সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার অর্থ এই নয় যে, আমাকে দুজনের সাথেই একমত হতে হবে। আমি মিথ্যার সাথে একমত হতে পারি না। আমাকে প্রথম শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে একমত হতে হবে। যিনি দুই দুই পাঁচ বলছেন তার সাথে কখনোই আমি একমত হতে পারি না। কারণ, আমি সত্যের বাহক, সত্যের বাণী প্রচার করি। আমি ২য় শিক্ষকের (পাঁচ বলনেওয়ালা) সাথে যুদ্ধ করবো না ঠিক আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমি সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারি। এটাই সেক্যুলারিজমের অর্থ।

কিছু কিছু মুসলিম বলে থাকেন যে, কুরআন বলে–

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنٌ ـ

অর্থ: "অর্থাৎ তোমার পথে তুমি যাও আমার পথে আমি যাই।" তারা কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেন কিন্তু তার প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট বা পূর্বাপর সম্পর্ক উল্লেখ করেন না।

আপনি যখন কুরআনের সূরা কাফিরূনের এই ছয় নাম্বার আয়াতটি উল্লেখ করবেন তখন অবশ্যই এর আগের পাঁচটি আয়াত উল্লেখ করা উচিত। যেখানে বলা হয়েছে

قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ـ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنٌ ـ

অর্থ: "হে নবী তুমি বলে দাও, হে কাফেররা, আমি (তাদের) এবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা কর। না তোমরা (তাঁর) ইবাদত করো যার ইবাদত আমি করি এবং আমি (কখনোই তাদের) ইবাদত করবো না যাদের ইবাদত উপাসনা তোমরা করে থাক। না তোমরা কখনো (তাঁর) ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত আমি করি। (এ দ্বীনের মধ্যে কোনো মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব) তোমাদের পথ ও কর্ম তোমাদের জন্যে আর আমার পথ ও কর্ম আমার জন্যে।" (সূরা আল কাফিরুন– ১-৬ আয়াত)

এখান থেকে একথা বলা যায় যে, কাফির হওয়ার বা প্রত্যাখান করার প্রশ্ন কেবল তখনই উঠতে পারে যখন আপনি তাদের সামনে সত্যের আহ্বান যথাযথ ভাবে তুলে ধরবেন, যখন আপনি ইসলামের সত্য আহ্বান তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন তখনই কেবল তাদের প্রত্যাখান করার প্রশ্ন আসতে পারে।

আরও কিছু মুসলমান আছে যারা প্রধানত রাজনীতিবিদ তারা বলে থাকেন– কুরআন বলছে যে, – لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা ২৫৬ নং আয়াত)

তারা কুরআনের এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন ঠিকই কিন্তু সেটি তারা পুরোপুরি বলেন না, পুরো আয়াতটি হচ্ছে–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ لَا انْفِصَامَ لَهَا ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوْتُ ـ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ـ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

অর্থ: "আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, কারণ সত্য এখানে মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল (মতাদর্শকে) অস্বীকার করে, আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনো দিনই ছিড়ে যাবার নয়, আল্লাহ তাআলা (সবকিছুই শোনেন) এবং (সবকিছু) জানেন। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), তিনি (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে তাদের (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, অপরদিকে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তি সমূহ) ই হয়ে থাকে তাদের সাহায্যকারী তা তাদের দ্বীনের আলোক থেকে কুফরীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। সূরা বাকারা আয়াত-২৫৬-২৫৭

আমিও স্বীকার করি যে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই তবে আমাদের ভুল উদ্ধৃতি বা ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আপনাকে তো প্রথমে তাদের সামনে সত্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এরপর আপনি তাদেরকে বাধ্য করতে পারেন না। তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করানোর কথাটা সম্পূর্ণ অচল ও ভুয়া।

আল কুরআনের সূরা আল আন আমের ১০৮নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوْا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ . كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ . ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থ: "তারা আল্লাহর বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি গালাজ করো না, নইলে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে না জেনে বিদ্বেষবশত: আল্লাহ তাআলাকেও তারা গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকেই তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, অতএব তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ার জীবনে) কি করে এসেছে। (সূরা আল আনআম আয়াত নং - ১০৮)

সূরা আল হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا . اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ . اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

অর্থ : "হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাত ও গোত্র বানিয়েছি যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তাআলাকে বেশী ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর পুংখানুপুংখ খবর রাখেন।" (সূরা আল হুজরাত আয়াত-১৩)

এখান থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর কাছে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, সম্পদ, বয়স এর কোনটাই বিবেচ্য নয়। বরং একমাত্র গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া।

বিশ্ব মানবতার সর্বোত্তম উদাহরণ আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পারি যে, আমরা যখন দিনে পাঁচবার বাধ্যতামূলক নামায আদায় করি। সহীহ বুখারীর কিতাবুল আযানের ৬৯২ নং হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন– "যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তোমরা তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে।"

অন্য আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে– "যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে তোমাদের মাঝে শয়তান না আসতে পারে।"

এখানে শয়তান বলতে ঐ শয়তানকে বুঝানো হয়নি যার দুটো শিং আছে বিকট চেহারা ইত্যাদি বরং এখানে শয়তান বলতে বুঝানো হচ্ছে- বর্ণ, জাতি, সম্পদ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে মানুষের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয় সেটাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আরেকটা হাদীসে এসেছে– "এভাবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেটা দিনে পাঁচবার হয়।"

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আরেকটা বড় দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তখন, যখন আমরা হজ্জ্ব করতে যাই। ধনী সামর্থবান ব্যক্তিদের জীবনে একবার হজ্জ্ব করা ফরয। সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মক্কায় সমবেত হয়। সেটাকে সারাবিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্মেলন বলা যেতে পারে। কমপক্ষে প্রতিবছর সেখানে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ জড়ো হয় আল্লাহর মহিমান্বিত ঘরকে কেন্দ্র করে। সেখানে সাদা কালোর কোনো প্রভেদ নেই। সবাই একই ধরনের দুটুকরো সাদা কাপড় পরিধান করে। এটাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। কে ধনী কে গরীব আপনি কখনোই পার্থক্য করতে পারবেন না, সবাই সমান, সবার এক পরিচয়, সবাই আল্লাহর বান্দা।

সূরা বনী ইসরাইলের ৭০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ـ

অর্থ: "আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে। আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র জিনিসসমূহ দিয়ে আমি রেযেক দান করেছি, অতঃপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের উপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং-৭০)

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম যে, মানুষের মধ্যে কোন বিশেষ ধরনের পার্থক্য করা হয়নি স্রষ্টার তরফ থেকে। ভাষা, বর্ণ, গোত্র নয় বরং আদমের সব সন্তানই আল্লাহর কাছে সমান ভাবে সম্মানিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা আন নিসার ১৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا ـ

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗ اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

অর্থ : "হে ঈমানদাররা, তোমরা (সর্বদাই) ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহ তাআলার জন্যে সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করো, যদি এ কাজটি তোমার নিজের, নিজের পিতা-মাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তা তোমরা মনে রাখবে) সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (এটা কখনো দেখবে না, কেননা) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তাআলার অধিকার অনেক বেশী। অতএব তুমি কখনো ন্যায় বিচার করতে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো, কিংবা (সাক্ষ্য দেয়া থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রাখবে) তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তাআলা তার যথার্থ খবর রাখেন। (সূরা নিসা আয়াত-১৩৫)

এখান থেকে জানা গেল আমাদের ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে যদি ও তা নিজের, পিতা মাতার ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। এটাই ইসলামের মৌল চেতনা।

সূরা মায়েদার ৩২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ: "কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া অন্য কোনোকারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; আবার এমনিভাবে যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো।" (সূরা মায়েদা আয়াত-৩২)

আমরা জানি যে, ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা:) এর সময়ে একজন মুসলিম একজন যিম্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ নিরাপত্তা ও যথাযথ নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত অমুসলিম প্রজা) হত্যা করে ফেললো। হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, কোনো মুসলিম যদি কোনো যিম্মীকে হত্যা করে তবে তাকেও হত্যা করা হবে। হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন যে, এধরনের হত্যাকাণ্ডে ইসলামের বিধান কী হবে? পরে যখন নিশ্চিত হলেন এবং মৃত্যুদণ্ড

দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন তখন নিহতের ভাই বললো আমার হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে এবং রক্তপণ নিতে কোন সমস্যা নেই। তখন হযরত আলী রাসূলের হাদীস অনুযায়ী উভয় পক্ষের সন্তুষ্ট চিত্তের মীমাংসা করে দিলেন এবং রক্তপণ আদায় করে তাকে মুক্ত করলেন। আর বললেন- ইসলামী রাষ্ট্রে একজন যিম্মীর জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম ঠিক ততটাই মর্যাদাবান ও পবিত্র ঠিক যতটা মর্যাদাবান ও পবিত্র একজন মুসলিমের সম্পদ জীবন ও সম্ভ্রম।

কিছু মানুষ এবং সমালোচক আছে যারা প্রায়শই কুরআনের প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ ছাড়াই কুরআনের আয়াত ভুলভাবে উদ্ধৃতি দেন এবং বলেন যে, কুরআন বলেছে যে, একজন কাফির মুশরিককে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে।

আয়াতাংশটি এরকম–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

অর্থ: "অতঃপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায় তখন মোশরেকদের যেখানে পাবে সেখানেই তোমরা হত্যা করবে।" (সূরা তাওবা আয়াত- ৫)

সুতরাং ইসলাম একটি বর্বর ও নির্দয় ধর্ম।

ঐ সমালোচকরা এমন কথা বলছে আয়াতেরর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা ছাড়াই। সে সময়কার প্রেক্ষাপটটি ছিলো এমন- কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। যেটা মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ একতরফাভাবে ভঙ্গ করে। পরবর্তীকালে যুদ্ধের ময়দানে এই উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়।

উদাহরণস্বরূপঃ ধরুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা সেনাবাহিনীর প্রধান আমেরিকা ও ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট অথবা সেনাবাহিনীর প্রধান আমেরিকার সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললো- যুদ্ধের ময়দানে যখনই যেখানে একজন ভিয়েতনামী পাবে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হত্যা করে ফেলবে।" তবে কি তাকে আমি একটা কশাই বলবো?

নামি এটা যুদ্ধের বা সামরিক বাহিনীর একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, জেনারেলরা তাদের অধীনস্তদের যুদ্ধের মাঠে এই নির্দেশ দেবে যে, শত্রুর সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করো এবং তাদের হত্যা করো।

হ্যাঁ অবশ্যই এটা সামরিক বাহিনীর অতি সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু ঐসব সমালোচকগণ সূরা তাওবার পাঁচ নম্বর আয়াত (উল্লিখিত আয়াত) ঠিকই বার বার আওড়াতে থাকেন কিন্তু তারা ভুলেও কখনো সূরা তাওবার ছয়

নাম্বার আয়াতটি (ঠিক পরের আয়াতটি) উল্লেখ করেন না যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে–

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ: "আর মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে। যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার (ইচ্ছানুযায়ী) কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। এটা এজন্যই যে, এরা আসলেই এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কিছুই জানে না।" (সূরা তাওবা আয়াত নং-৬)

যে কোন যুক্তিবাদী ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষই এটা স্বীকার করবে যে, আগের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব ৬নং আয়াতে রয়েছে।

আমি এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজকের বিশ্বে এমন কোন আর্মি জেনারেল আছে কি, যিনি তার প্রাণের দুশমনকে আশ্রয় চাইলে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেবে এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে তার কাংখিত এলাকায়ে তাকে পৌঁছে দেবে?

ইসলাম শুধু এ ধরনের দুশমনকে নিরাপত্তাই দেয় না বরং তাকে আল্লাহর কালাম শোনার সুযোগ প্রদান করে এবং নিরাপদে কাংখিত স্থানে তাকে পৌঁছে দেবার নির্দেশ প্রদান করে। এখন ভেবে দেখুন ইসলাম কতটা মানবিক ও কল্যাণকামী।

সুতরাং কিছু লোক ভুলভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করেই মন্তব্য করে বসে যে, ইসলাম একটি নির্দয়, নির্মম ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে, তাদের অভিযোগের কোনোরকম ভিত্তি নেই।

আসল ব্যাপার হলো– ইসলামের যুদ্ধনীতি কতটা মানবিক ও যৌক্তিক তা মহানবী ﷺ এর নিম্মোক্ত হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে একজন মুমিন কখনোই কোনো শিশুকে আঘাত করবে না, বৃক্ষ কাটবে না, অসহায় নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন বেসামরিক লোককে হত্যা করবে না, সংসার বৈরাগী সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করবে না, কোনো উপাসনালয় ধ্বংস করবে না।

আল কুরআনের সূরা মুমতাহিনার ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অর্থ: "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ্ তাআলা কখনো তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়নদের ভালোবাসেন।"

আল্লাহ এখানে বলছেন যে, অমুসলিমদের মধ্যে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তোমাদেরকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করেনি, আল্লাহ পাক আশা করেন যে, তোমরা তাদের প্রতি সদয় ও মানবিক হবে। আর আল্লাহ এধরনের সুন্দর আচরণ অবলম্বনকারীদের ভীষণ পছন্দ করেন।

সূরা মুমতাহিনার পরবর্তী ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ: "আল্লাহ্ তাআলা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের বিরুদ্ধে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং (একই কারণে) তোমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে (এরপরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম।"

আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে এবং তা পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইসলাম তরবারীর জোরেই প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমন ভুল ধারণা থেকে বাঁচার জন্যে এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর ও যথাযথ বক্তব্য দিয়েছেন ডিলেসী অনেরী নামের একজন অমুসলিম পণ্ডিত। তিনি তার Islam and Cross road নামক বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, ইতিহাসে এটা খুবই পরিষ্কার যে, গোঁড়া মুসলিমগণ রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করে

সারা পৃথিবী জয় করেছে এমন কাহিনীকে ইতিহাসবিদগণ আশ্চর্যজনকভাবে বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

অর্থাৎ ইতিহাসবিদ এই কল্পিত কাহিনীই বার বার পুনারাবৃত্তি করেছেন যে, তরবারী দিয়েই ইসলাম পৃথিবীর জাতিসমূহকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

এর জবাবে আমরা আরো বলতে চাই যে, মুসলিমগণ প্রায় ৮০০ বছর ধরে অতি গৌরবের সাথে স্পেন শাসন করেছে, ইউরোপকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু আজ বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, স্পেনের মসজিদগুলোতে আযান হয় না বা প্রকাশ্যে আযান দেয়ার মত একজন মুসলিমও সেখানে নেই। অর্থাৎ সেখান থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হয়েছে খ্রিস্টানদের অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মাধ্যমে।

ইসলাম কখনোই তরবারীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি বরং দাওয়াহ্‌র মাধ্যমে সে মানুষের হৃদয় জয় করেছে। অথচ প্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলাম তরবারীর জোরেই প্রচারিত হয়েছে।

আমরা আরো বলতে চাই যে, আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিমরা আরব ভূখণ্ড শাসন করে আসছে একেবারে এককভাবে। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র আরব ভূমিতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ জন্মগত খ্রীস্টান বসবাস করছে এবং তাদের ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে। যদি ইসলাম তরবারীর মাধ্যমেই প্রচারিত হতো তবে আরবে একজন অমুসলিমও থাকার কথা নয়। এটা জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম তরবারী দিয়ে আদর্শ প্রচারকে মোটেও বিশ্বাস করে না।

ভারতের কথাই যদি আমরা ধরি তাহলে কী দেখতে পাই এই ভারতকে মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে শাসন করেছে। দোদণ্ড প্রতাপশালী মোঘল সম্রাট ও বিভিন্ন রাজবংশের শক্তিশালী অজেয় সুলতানগণ এই ভারতের মসনদে আসীন ছিলেন। যদি ইসলাম তরবারীর মাধ্যমেই প্রচারিত হতো তবে আজ একজন অমুসলিমও এ অঞ্চলে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এখানে মুসলিমরা বর্তমানে সংখ্যালঘু মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। আর অন্যদিকে অমুসলিমরা হচ্ছে শতকরা ৮৫ ভাগ।

আপনাকে বলতে হবে, আজকে মালয়েশিয়ায় যে ৬০% মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করে সেখানে কোন্ সেনাবাহিনী ইসলাম প্রচার করেছে? ইন্দোনেশিয়া আজ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। ইতিহাস বলতে পারে না যে, কোন্ সেনাবাহিনী সেখানে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছিলো?

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ইসলাম প্রচার করেছে? এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন থমাস কার্লাইল তার রচিত বিখ্যাত 'Hero and Hero's worship' গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় বলেছেন– প্রত্যেকটি মতবাদ মস্ত মানুষের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাহসিকতার সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এটা তরবারী দিয়ে কখনো প্রচার করা যায় না। বরং বুদ্ধি ও কৌশলের তরবারীই এখানে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

আল কুরআনের সূরা আন নাহলের ১২৫ নং আয়াতে একথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

অর্থ : "হে নবী তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; তোমার মালিক এটা ভাল করেই জানেন, কে তাঁর পথ থকে বিপথগামী হয়ে গেছে, আবার যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কে ও সবিশেষ অবহিত আছেন।" (সূরা আন নাহল-আয়াত নং-১২৫)

রিডার্স ডাইজেস্ট ১৯৯৬ সংখ্যায় বলা হয়েছে, ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বর্ধনশীল ধর্ম। ১৯৩৪-১৯৮৪ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছরে ইসলামে আগমনকারীদের সংখ্যা ছিলো ২৩৫% খ্রিষ্টান হয়েছিলো ৩৭%।

কোন সেনাবাহিনী বা কোন তরবারী গত বিংশ শতাব্দীতে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রগামী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। বর্তমানে কোন মুসলিম সেনাবাহিনী বা কোন তরবারী আমেরিকা ও ইউরোপবাসীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে?

ইসলাম সেক্যুলার (দুনিয়ার কাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ততাঅর্থে) এবং একটু বেশীই সেক্যুলার। কারণ, এটা সন্ন্যাসবাদে বিশ্বাস করে না এবং পূর্ণরূপে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম সেক্যুলারিজমের প্রতি সহনশীল কিন্তু সেক্যুলারিজম ইসলামকে বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারে না। কারণ, সেক্যুলারিজম বলে- ধর্মীয় ও প্রত্যাদেশ বাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন কিছুকে কিছুতেই বরদাশত

করবো না। এদিক থেকে সেক্যুলারিজম ইসলামের জন্য চরম হুমকি ও চরমপন্থী মতবাদ। কোন্ তরবারী মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করাচ্ছে? তার উত্তরে বলে–

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

অর্থ : "তিনি তাঁর রাসূলকে একটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে (রাসূল) একে দুনিয়ার প্রচলিত সব কয়টি ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দিতে পারে। তা মোশরেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন।" (সূরা সাফ আয়াত নং-৯)

এ আয়াতটি আল কুরআনের আর দুটি স্থানে এসেছে– যেমন সূরা তাওবায় বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

অর্থ : "তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়েত ও সঠিক জীবন বিধান সহকারে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সবকয়টি বিধানের উপর বিজয়ী করে দিতে পারে। মোশরেকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।" (সূরা তাওবা আয়াত নং-৩৩)

এছাড়া একই ধরনের আয়াত সূরা আল ফাতাহ এর মধ্যে এসেছে– আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا -

অর্থ : "তিনিই হচ্ছেন সেই মহান স্বত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে যথার্থ পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রাসূল দুনিয়ার অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারে, সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আল ফাতাহ আয়াত নং-২৮)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর তাৎপর্যে এটিই বুঝা গেলো যে, ইসলাম সব ধরনের মতবাদকে জয় করতে চায়। আর এজন্য আমাদের হাতে একটি বন্দুক আছে, তা হচ্ছে আল কুরআন। এটা সরাসরি মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে এবং তা জয় করে নেয়। আমি এখানে সূরা ইসরার ঐ আয়াতটি উদ্ধৃত করতে চাই যেখানে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا ـ

অর্থ : "তুমি ঘোষণা দাও (হে নবী) সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশ্য মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতেই হবে। আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে তাদের রোগের উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা জালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং-৮১-৮২)

এডাম পিয়ার্সেন বলেছেন, "মানুষ একদিন চিন্তিত ছিলো না জানি আরবদের হাতে কী ভয়ংকর অস্ত্র আছে? এর উত্তরে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আরবদের পারমাণবিক বোমা তো সেদিনই এ বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেদিন নবী মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম হয়েছে।" পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার অমোঘ বাণী–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার প্রতিশ্রুতি ও নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম।" (সূরা আল মায়েদা আয়াত নং-৩)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ ১। আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যায় আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে। মনে করুন আমার বন্ধু 'জন' সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, বাচ্চাটি কি ছেলে না মেয়ে? এ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া কি সম্ভব?

আসলে প্রকৃত ব্যাপার হল 'জন' একজন পুরুষ। সুতরাং তার পক্ষে যেখানে বাচ্চা জন্ম দেয়ারই প্রশ্ন উঠেনা সেখানে সে বাচ্চাটি কি ছেলে না মেয়ে এ প্রশ্ন অবান্তর। ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি অবাস্তব যে তাকে কে সৃষ্টি করেছে? কেননা আল্লাহ তা'আলার সংজ্ঞা তথা সত্যিকারের ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল তিনি সৃষ্টি হননি। তিনি কারও সন্তান নন অর্থাৎ তিনি জন্মান নি। সুতরাং যদি এ ধরনের কোন ঈশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়, যিনি বানানো ঈশ্বর তথা যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে তিনি সত্যিকারের ঈশ্বর নন। অন্য কথায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টা আছে সে সত্যিকারের ঈশ্বর নয়। কারণ, সত্যিকারের ঈশ্বর কেবল তিনিই যার শুরুও নেই শেষও নেই অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি হননি এবং যার ধ্বংস নেই। এ কারণেই আমরা কালেমা শাহাদাতে বলি, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।'

তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিচয় হল তিনি সৃষ্টি হননি বরং তিনি একক। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাকে সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য সব কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট নন বরং সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি।

প্রশ্ন ঃ ২। আমি পবিত্র কোরআনে পড়েছি যে, আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ কথা শুনে একজন ব্যক্তি আমাকে বলল যে, যেহেতু আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন সেহেতু আমি যে পাপ করি সেটাও আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একজন ব্যক্তি মুসলিম হবে কি অমুসলিম হবে সেটাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমি এখানে তাকদীর তথা অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ আপনি কোরআনের যে কথাটি বললেন প্রকৃতপক্ষে সেটা অদৃষ্ট সম্বন্ধে নয়। আর এখানে শব্দটা নিয়ন্ত্রণ হবে না; বরং হবে সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং এ দুটো ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাই হোক, এখন অদৃষ্ট সম্পর্কে আসা যাক অনেকের মধ্যেই অদৃষ্ট বা তাকদীর সম্পর্কে ধারণা হল যে, আল্লাহই সবকিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোন চোর যদি চুরি করে এর জন্য দায়ী কে হবে? নিশ্চয়ই তিনি যিনি চুরি করাটা তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। যদি কারও তাকদীরে লিখা থাকে যে সে মানুষ হত্যা করবে তাহলে

সেই হত্যার জন্য ঐ ব্যক্তি দায়ী হতে পারে না, বরং দায়ী হবে অদৃষ্টের লেখক অর্থাৎ আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। এমন কি, কারও অমুসলিম হওয়াটা যদি তার ভাগ্যে লেখাই থাকে তাহলে সে দোযখে যাবে কেন?

প্রকৃতপক্ষে এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে তা হল কদরের অর্থ বুঝতে ভুল করা। আমাদের অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে হবে, এটা নিয়ম। কিন্তু সাথে আমাদের এটা জেনে নিতে হবে যে অদৃষ্ট বলতে কি বুঝায়? এটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যেতে পারে।

ধরুন, একটা ক্লাসে এক'শ জন বসে আছে। ক্লাসটি হচ্ছে বছরের শেষ দিকে বার্ষিক পরীক্ষার আগে। ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের দেখিয়ে বলছেন, তুমি হবে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। তুমি পাবে সেকেন্ড ক্লাস আর তুমি ফেল করবে। এখন বার্ষিক পরীক্ষা হল এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল প্রথমজন ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, দ্বিতীয় জন সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে এবং তৃতীয় জন ফেল করেছে। এখন তৃতীয়জনের ফেল করার জন্য কি টিচারকে বলার সুযোগ আছে যে আপনি বলেছিলেন বিধায় আমি ফেল করেছি? না এ সুযোগ নেই। কারণ উক্ত শিক্ষক তাদের এক বছর পড়িয়েছেন, তাই তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত ছাত্রদের পারফরমেন্স দেখে অনুমান করেছেন যে, কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে, কে সেকেন্ড ক্লাস পাবে আর কে অমনযোগী বিধায় খারাপ করবে? এখানে শিক্ষকের এ অনুমানকে দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই।

ঠিক তেমনি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ, তিনি এ টিচারদের থেকেও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে এবং তাঁর আছে ইলমুল গায়েব অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের কথাগুলো জানেন। এগুলো তিনি একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন। সুতরাং মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, এটা আল্লাহর জানা আছে বলে তাকে ঐ কর্মের জন্য দায়ী করা হবে, এমনটি করার সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ মনে করি, একজন লোকের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য পাঁচটি রাস্তা সামনে আছে। আল্লাহ পূর্ব হতে জানেন যে, লোকটি দ্বিতীয় রাস্তাটি বেছে নেবে তাই তিনি সেটা লিখেছেন। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, তিনি লিখে রেখেছেন বলে লোকটি দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়; বরং লোকটি দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে যাবে বলেই আল্লাহ সেটা লিখে রেখেছেন।

আবার ধরুন, আপনি একজন ভাল ছাত্র। ইন্টার পরীক্ষায় আপনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিতে এ প্লাস পেয়েছেন। এখন আপনি ডাক্তারও হতে পারেন আবার ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন। আপনি ঠিক করলেন আপনি ডাক্তার হবেন। আল্লাহ জানেন আপনার চয়েস দুটো, তবে আপনি ডাক্তার হবেন। তাই আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন। এরপর আপনি যখন রুজি রোজগার শুরু করবেন

তখন আপনি সৎভাবেও কামাই করতে পারেন আবার দুর্নীতিও করতে পারেন। ধরি, আপনি আপনার রোজগার দুর্নীতির মাধ্যমে করলেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা পূর্বে থেকেই জানেন বলে তিনি লিখে রেখেছেন। এমন নয় যে, তিনি আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলেই আপনি হারাম পথে রোজগার করবেন। এটাই হল তাকদীর তথা অদৃষ্ট।

তবে তাকদীরের কিছু জিনিস আছে নির্ধারিত যেমন কে কখন জন্মাবে কার মৃত্যু কখন হবে ইত্যাদি। আল্লামা ইকবাল বলেন, "খুদ কো কর, ইতনা বুলন্দ কেয়া তাকদীর কে পেহলে আল্লাহ আপনে বান্দাছে পুছলে কে বাতাদে রাজা কেয়া হ্যায়।"

অর্থাৎ, নিজেকে এতটাই মহান বানাও যে অদৃষ্ট লেখার পূর্বে আল্লাহর নিজের বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার ইচ্ছা কি?

সুতরাং আমাদের অপরাধগুলোর জন্য আমরাই দায়ী। কেউ যদি চুরি করে সে চুরির জন্য সেই দায়ী। এজন্যই আল্লাহ আমাদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ কোরআন পাঠিয়েছেন। যে কোরআন মেনে চলবে না এর জন্য দায়ী সে-ই হবে অন্য কেউ নয়।

একইভাবে যারা অমুসলিম তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যেকটি শিশু প্রকৃতিগতভাবে মুসলিম হয়ে জন্মায়, পরবর্তীতে তার গুরুজনেরা তাকে পথভ্রষ্ট করে। সুতরাং কারও অমুসলিম হওয়া আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দেন নি। কারণ একজন অমুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুযোগ আছে যে, সে তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে কোরআন অধ্যয়ন করে মুসলিম হতে পারবে।

আর এজন্যই হাশর ময়দানে বিচার করা হবে মানুষের কর্মের আলোকে। যে ভাল কাজ করবে সে জান্নাত পাবে। আর যে মন্দ কাজ করবে সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

প্রশ্ন ঃ ২৬। আমরা খ্রিষ্টানদের প্রায়ই বলতে শুনি সেইন্ট পিটার্স, সেইন্ট জোসেফ, সেইন্ট অ্যাস্টিন ইত্যাদি। আসলে এ সেইন্ট বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ খ্রিষ্টান ধর্মমতে, সেইন্ট মানে একজন পবিত্র লোক, যে আল্লাহর কাছে থাকে। তাদের বিশ্বাস হল সেইন্ট উপাধি দিতে পারেন একমাত্র পোপ। সেইন্ট উপাধি তখন-ই দেয়া যায় যখন লোকটি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার দুটি অলৌকিক কাজ ছিল। সম্প্রতি মাদার তেরেসার মৃত্যুর পর মাদার তেরেসাকে সেইন্ট উপাধি দেয়ার ব্যাপারে ভ্যাটিকান সিটিতে মিটিং বসেছিল। কিন্তু তার একটিমাত্র অলৌকিক কাজ তারা খুঁজে পেয়েছিলেন বিধায় তাকে সেইন্ট উপাধি দেন নি।

প্রশ্ন ঃ ২৭। কিভাবে একজন অমুসলিমকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনে ধর্মপ্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে। সূরা নাহলের ১২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমত এবং সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।"

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আমরা সব মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করব হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করতে হবে সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

হিকমাত যা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে কোথাও বলা হয়নি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেটা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটাও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বদলায়। যেমন ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা দেন তাদের অসুস্থতা ও অসুস্থতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে। দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তেমনি অমুসলিম বন্ধুকে আগে বুঝতে হবে। অতঃপর তার মনমানসিকতা বুঝে তাকে দাওয়াত দিতে হবে। এটাই হল হিকমাত।

হিকমাত বলতে নরম গলায় বলাও হতে পারে, আবার জোরে জোরে বলাও হতে পারে। আবার কারও নিকট হিকমা হল বিজ্ঞান ও ইতিহাস নিয়ে বলা। দাওয়াত দেয়া হল আবশ্যক। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতেই দেয়া আবশ্যক নয়।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হলে প্রথমে আপনার জানা উত্তম পদ্ধতিতেই অগ্রসর হবেন। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে,

"আমার নিকট হতে একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর।"

অর্থাৎ আপনার যতটুকু জানা আছে, আপনি যদি নিশ্চিত হন যে তা সঠিক; তবে তা প্রচার করুন। প্রথমেই আপনাকে শেখ আহমদ দিদাত হতে হবে, তারপর দাওয়াত শুরু করবেন এমন কোন কথা নেই।

আমার মতে দাওয়াত দেয়ার একটি মূলমন্ত্র আছে যা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ـ

অর্থ : "বল হে আহলে কিতাব! এস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের **মধ্যে এক।** আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, আল্লাহর সাথে কাউকে **শরীক করি** না। আমাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল, "তোমরা সাক্ষ্য থাকো যে, আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"

এটা হল অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার একটি পদ্ধতি। যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি যদি জানেন যে, আপনার বন্ধুর সাথে আপনার সাদৃশ্যগুলো কি কি? তবে আপনি আরও ভালভাবে দাওয়াত দিতে পারেন। শুরুতে আপনি আপনার অমুসলিম বন্ধুটিকে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে পারেন, তাকে পুস্তিকা বা ভিডিও সিডি দিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ২৮। নবী ﷺ বলেছেন, "আমার কাছ হতে একটি আয়াত হলেও প্রচার কর।" অথচ অনেকে দাওয়াত দিতে গেলে বলে জুম্মায় জুম্মায় আট দিনও হয়নি এখনই এ অবস্থা। এদের জবাবে কি বলব?

উত্তর ঃ আপনি যে **কথাটা বললেন** তা **কেবল একজন মুসলিম**-ই আপনাকে বলবে। আপনি তাকে জবাব দিবেন যে, "**জুম্মায় জুম্মায় আট দিন** হতে হলে তা অনেক দেরি হয়ে যাবে অথচ আমাদের নবী ﷺ বলছেন, একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। সুতরাং দাওয়াতী কাজ এখনই শুরু করতে হবে। আপনি যদি নবীজী ﷺ-কে মানেন তবে একটি আয়াত জানা মাত্রই তা প্রচার শুরু করে দিন।"

অমুসলিমরা আপনাকে এ ধরনের কথা বলবে না। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে দাওয়াতের পদ্ধতিও ভিন্ন হবে। দাওয়াত দেয়ার একটা কৌশল হল কোন বাধা না দেয়া প্রতিপক্ষের বক্তব্য দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করা। দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ভয় বা লজ্জা পাওয়া যাবে না; বরং প্রতিপক্ষের যেকোন প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিমত্তা সহকারে দিতে হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۔

অর্থ ঃ "যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করে তাদেরকে আমি পথ দেখাব।"

সুতরাং যতটুকুই আমরা জানি তা নিয়েই দাওয়াত শুরু করতে হবে এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ মৌলিক বিষয় হল আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশ্ন ঃ ২৯। আমরা জানি, মুসলিমদের জন্য দাওয়াত দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের জন্য দাওয়াত দেয়াটা খুব কঠিন। তারা ঘরের দেখাশোনা করে, ভদ্রতা বজায় রাখে। আর সে যদি অন্তর্মুখী

হয় তাহলে তার জন্য দাওয়াত দেয়াটা আরও কঠিন। এ ব্যাপারে কিছু **বলবেন কি?**

উত্তর ঃ দাওয়াত দেয়া শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, আবশ্যক। সুতরাং আপনার দওয়াত দিতে হবে। অনেক মানুষের ধারণা যে শুধুমাত্র বহিঃমুখী হলেই দাওয়াত দিতে পারবেন। আরেকটা ভুল ধারণা হল দাওয়াত মানে কথা বলা। দাওয়াত মানে শুধু কথা বলা নয়। চিঠি লেখা, ই-মেইল, এসএমএস ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়ও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। সুতরাং অন্তর্মুখী কোন নারীর পক্ষেও দাওয়াত দেয়া কঠিন কিছু নয়। তবে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিপর্যায়ে পুরুষ কেবল পুরুষ ও নারী কেবল নারীদের দাওয়াত দিতে পারবে।

দাওয়াত দেয়া শুরু করতে হয়ত দ্বিধা বা সংকোচ কাজ করতে পারে। লজ্জার কারণে দাওয়াত দিতে বিব্রতবোধ করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর পথে কেউ জিহাদ করলে তার পথ আল্লাহ সহজ করে দেন। আমি নিজে এক সময় তোতলা ছিলাম। পরবর্তীতে দাওয়াতের কাজ শুরু করতে আল্লাহ আমার ভাষার জড়তা দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি যদি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন আল্লাহ আপনার পথ সহজ করে দেবেন। আল্লাহ সাহায্য করলে কেউ তাকে হারাতে পারে না, আর আল্লাহ সাহায্য না করলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "মুমিনদের শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।"

অনেক সময় শুধুমাত্র আপনার বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলনের মাধ্যমেও **আপনি দাওয়াত দিতে পারবেন।** এরকম একবার হয়েছিল আমাদের IRF-এ। **আমরা মহিলাদের** দাওয়াতের ট্রেনিং দেয়ার জন্য দায়ী সংগ্রহ করছিলাম। আমি ও **আমার বোন তাদেরকে** তাদের সাথে কথা বলছিলাম প্রশ্ন করেছিলাম ও প্রশ্নের জবাব **দিচ্ছিলাম। তাদেরকে** আমরা পর্দা বা পোশাক সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কথা না বললেও **তাদের মাঝ** হতে দুই একজন অমুসলিম প্রশ্ন করেছিল যে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে **তাদের কী** পোশাক পরে আসতে হবে? শাড়ি বা স্যালোয়ার কামিজ পরে আসা যাবে **কি না?** এর কারণ তারা আমার বোনকে দেখেছিল হিজাব পড়া অবস্থায়। সুতরাং এক্ষেত্রে তার বাইরের এপেয়ারেন্সটাই তার দাওয়াতী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং আপনি দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ আপনার কাজ সহজ করে দেবেন।

প্রশ্ন ঃ ৩০। আমরা জানি, ইসলাম অ্যানথ্রোপোমরফিজম-এর দর্শনে বিশ্বাস করে না। তাহলে ইসলাম-ই কেন বলছে, আল্লাহর হাত আছে কিংবা কেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহকে দেখতে পাব?

উত্তর ঃ অ্যানথ্রোপোমরফিজম মানে হল পৃথিবী স্রষ্টার এমন জীবজন্তুর রূপ নিয়ে আসা যেগুলো সম্পর্কে মানুষের জানা আছে। যেহেতু স্রষ্টা জীবের রূপ নিয়ে আসছে, মানুষ ঐ জীবরূপী ঈশ্বরকে সম্মান দেবে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দর্শনে বিশ্বাস করে না।

অ্যানথ্রোপোমরফিজমের ভিত্তি হল এ বিশ্বাস যে, "আমাদের সৃষ্টিকর্তা এত মহান, এত পবিত্র, এত ধার্মিক যে তিনি মানুষের অসুবিধাগুলো বুঝতে পারেন না। তিনি এত পবিত্র ও বিশুদ্ধ যে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না (নাউযুবিল্লাহ) যে, মানুষের কেমন লাগে যখন ব্যথা পায় বা কোন সমস্যা বা বিপদে পড়ে। তাই তিনি একজন মানুষ হয়ে জানতে চান যে কোনটা মানুষের জন্য ভাল আর কোনটা খারাপ।"

অন্য কথায়, স্রষ্টা এত পবিত্র যে, তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতাগুলো উপলব্ধি করতে পারেন না, তাই তিনি মানুষ হয়ে জানতে চান তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে চান।

এ যুক্তিটা শুনতে খুব ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ যদি একটি ভিসিআর তৈরি করে, উক্ত ভিসিআরের সমস্যাগুলো বুঝতে কি তার ভিসিআর হতে হবে? অবশ্যই না; বরং ভিসিআরটির তৈরিকারী হিসেবে তার নিজেরই জানা থাকবে যে, ভিসিআরটি কিভাবে চালালে সমস্যা সৃষ্টি হবে আর কিভাবে চালালে কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই চলবে? সে এ জ্ঞান থেকে একটা ব্যবহারবিধি তৈরি করবে যেন ভিসিআর যে চালাবে সে সঠিকভাবে চালাতে পারে।

একইভাবে মানুষ জাতির স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিধি দিয়েছেন, তা হল পবিত্র কোরআন।

এখন অনেকে মনে করেন কোরআনে যে আল্লাহর হাতের কথা বলা আছে তা মানুষের হাতের মত। বিশেষ করে যারা এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন তারা এমনটিই মনে করে থাকেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা শূরার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে−

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ـ

অর্থ ঃ "কোন কিছুই তার সাদৃশ্য নয়।"

অর্থাৎ আল্লাহর সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। তিনি শোনেন ও দেখেন, তবে সে শোনা বা দেখা আমাদের মত নয়। একইভাবে সূরা ইখলাসের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ ঃ "তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

সুতরাং কোরআনের যেখানে আল্লাহ হাতের কথা বলছেন সেখানে তিনি মানুষের হাতের মত কোন হাতের কথা বলছেন না। এভাবে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলেও সে বৈশিষ্ট্যগুলো তার কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং তিনি তাঁর হাত বলতে কি বুঝিয়েছেন, তা কি রকম সে ব্যাপারে তিনিই ভাল জানেন। ঠিক তেমনি মানুষের মত তাঁর শ্রবণশক্তি শব্দ তরঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তিনি কিভাবে শুনেন তা তিনিই ভাল জানেন। আর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে বলা যায় যে, পৃথিবীর এ চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না, এটা নিশ্চিত। তবে কেয়ামত দিবসে তাঁকে দেখা যাবে এবং কিভাবে দেখা যাবে সে ব্যাপারে তিনিই ভাল জানেন।

অন্যান্য ধর্মে অ্যানথ্রোপোমরফিজম বলতে মানুষ-ঈশ্বরকে বুঝায়। ঈশ্বর যখন মানুষের রূপ নিয়ে জন্মান তখন তার খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা আনআমের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ـ

অর্থ ঃ "তিনি খাদ্য দান করেন, তাকে কেউ খাদ্য দান করে না।"

আবার মানবরূপী ঈশ্বরের ঘুমানোর দরকার হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তিনি কখনও ঘুমান না এবং তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।'

সুতরাং কোরআনে আল্লাহর হাতের যে কথা বলা আছে তা অ্যানথ্রোমরফিজম নয়। তাই এর প্রকৃত অর্থ বা রূপ কি তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা এবং কোন সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন ঃ ৩১। মহিলারা বাইরে কাজ করতে পারবে কি? তারা কি ক্যারিয়ার গড়তে পারবে?

উত্তর ঃ পুরুষকে যেমন উপার্জন করতেই হবে তেমনি মহিলারা কাজ করবেই এটা আবশ্যক নয়। ইসলামে একজন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের আগে

তার বাবা বা ভাইয়ের আর বিয়ের পরে তার স্বামীর। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়। তবে কোন নারী নিজের ইচ্ছায় উপার্জন করতে চাইলে করতে পারবে। আর যদি সে বলে আমি কাজ করতে চাই না তাহলে স্বামী জোর করতে পারবে না।

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু এ সমান মানে অভিন্ন নয়। কোন পুরুষ যদি চায় যে সে গর্ভধারণ করবে তা কি সম্ভব? সম্ভব নয়।

ইসলামে কিছু কাজ ফরজ, কিছু সুন্নত আর কিছু নফল। অর্থাৎ কাজের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। লক্ষ্যণীয় যে, এ ক্যাটাগরি অনুযায়ী পুরুষদের ওপর নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া ফরজ। এছাড়া নারী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কাজের ভিন্নতা থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, নারীরা যদি প্রয়োজনে উপার্জন করতে চায়, করতে পারবে, শর্ত হল তারা হিজাব পরবে, পুরুষ ও নারীর কর্মস্থল হবে আলাদা। তারা একসাথে কাজ করবে না। প্রয়োজন হলে তারা কথা বলতে পারবে, কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত গল্প, গুজব, আড্ডা, হাসি-তামাশা ইত্যাদি করা যাবে না। নারী পুরুষ একসাথে কাজ করার ফল কি হয় তা সবারই জানা।

মহিলারা শিক্ষক হতে পারে, ডাক্তার হতে পারে, কাপড় বানাতে পারে এমনকি ব্যবসায়ীও হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্র আলাদা হতে হবে।

কিছু কিছু কাজ মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। আবার কিছু কিছু কাজ পুরুষদের জন্যও নিষিদ্ধ। কিছু কাজ উভয়ের জন্যই হারাম। মহিলাদের মডেলিং করা, নাচার সুযোগ ইসলামে নেই। তেমনি পুরুষ বা নারী কারও জন্যই মদের দোকানে কাজ করা জায়েয নেই। জুয়ার আসরে কাজ করাও উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

মহিলারা অবশ্যই ক্যারিয়ার গড়তে পারবে, তবে তা ইসলামী শরীয়ার মধ্যে থেকে। মহিলাদের প্রধান দায়িত্ব হল মা ও স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু মহিলারা যদি তাদের এ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন না করে শুধু চাকরিতে মনোনিবেশ করে তাহলে তারা তাদের ইসলাম প্রদত্ত সম্মান হারাবে। একজন মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ -

অর্থ ঃ "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।"

এছাড়াও সহীহ বুখারীর বুক অব আদাব ৮ নং খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ ـ

অর্থ : "একজন লোক নবীজী ﷺ প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বেশি ভালবাসা কার প্রাপ্য? নবীজী ﷺ সে লোকটিকে বললেন তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? নবীজী ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? নবীজী ﷺ আবারও বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কাকে ভালবাসব। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তোমার বাবা।

অর্থাৎ চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা ও সাহচর্য পাবেন মা ও একভাগ পাবেন বাবা। কিন্তু যে সকল মহিলারা তাদের ক্যারিয়ারের পিছনে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে, তারা তাদের এ বিশাল সম্মান হারাচ্ছে। এখানে হালাল ক্যারিয়ারের কথাই বলছি। হারাম কাজ যেমন মডেলিং করার প্রশ্নই ওঠে না।

যাইহোক, ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে মহিলারা ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন। যাতে করে জান্নাতে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ ৩২। আমি একজন হিন্দু। আমার মতে আমরা যে যে ধর্মের অনুসারী হই না কেন, আমরা সবাই ঈশ্বরের উপাসনা করছি। আমাদের উপাসনার নিয়ম হয়ত আলাদা, কিন্তু আমার মনে হয় উপাসনার নিয়মটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল মন থেকে উপাসনা করা। আমাদের হিন্দুধর্মের দর্শন বলছে যে কোন মানুষই মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চতর স্তরে যেতে পারবে, কিন্তু আপনার মতে নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর উপরে কেউ যেতে পারবে না। আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে একমত নই। এ বিষয়ে আপনার কর্তব্য কি?

উত্তর ঃ আপনি বললেন যে, উপাসনার পদ্ধতি যাই হোক না কেন মন থেকে উপাসনা করতে হবে। কিন্তু ভাই মন থেকে করলেও ঠিক কাজ করতে হবে। কেউ যদি মন থেকে চুরি করে সেটা কি ঠিক হবে? অর্থাৎ আপনি মন থেকে পূজা করছেন ঠিক আছে, কিন্তু কার পূজা করছেন, কেন করছেন এবং কিভাবে করছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন দিয়ে চোরের পূজা করে বা রাবনের পূজা করে কিংবা বলে আমি রাক্ষসের পূজারী, তাহলে আপনি কি মেনে নেবেন? মানার কথা নয়, আর যদি মেনেও নেন তাকে আপনি নিচু স্তরে রাখবেন, উপরের স্তরে নয়। আমরা চাই, সব মানুষই যেন উপরের স্তরে থাকে, তাই নয় কি? আর যদি একটা

ভাল কাজ দুটো পদ্ধতিতে করা যায় এবং দুটোই ঠিক হয় তাহলে উভয়টিই মেনে নিতে কোন সমস্যা নেই।

এখন উপরের স্তরে পৌছার ব্যাপারটিতে আসা যাক। ইসলাম অনুসারে আল্লাহর পরে মর্যাদার দিক দিয়ে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর স্থান। কোন মানুষ তাঁর ওপরে যেতে পারবে না। কারণ আমরা জানি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং কোরআন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরের হলেন নবী রাসূলগণ। এছাড়া মুহাম্মদ ﷺ-এর পরে কোন নবী অথবা রাসূল আসার সম্ভাবনা নেই। কোরআনে সূরা আহ্যাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -

অর্থ ঃ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"

যদি কেউ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পর নবুয়তের দাবি করে তার উচিত পাগলের ডাক্তার দেখানো। সুতরাং কোরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় নবী রাসূলদের মত মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, তবে তাদের মত মর্যাদা লাভের জন্য যে কেউ চেষ্টা করতে পারবে। অর্থাৎ তাদের ১০০% মেনে চলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এমনকি হয়ত চেষ্টা করতে করতে কেউ কাছাকাছি পৌছেও যেতে পারে। কিন্তু তাদের স্তরে পৌছানো সম্ভব নয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষ শুধু নবী নয়; বরং অবতারও হতে পারে তথা ঈশ্বরের স্তরে পৌছাতে পারে। তবে এ স্তরে পৌছার জন্য ঈশ্বরের ভক্তি করতে হবে তথা ধ্যান করতে হবে দুনিয়াদারী বাদ দিয়ে। অন্যদিকে, ইসলাম অনুসারে দুনিয়াদারী ও ধর্মের পরীক্ষা একটা অংশ। দুনিয়াদারী বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়; বরং সবকিছু ভারসাম্য বজায় রেখে করাই ইসলাম। ইসলাম অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরের স্তরে পৌছতে পারবে না, কারণ তিনি মানুষ নন। আর নবী-রাসূলগণ হলেন ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত মানুষ যারা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। এ কারণে মানুষের পক্ষে তাদের স্তরেও পৌছানো সম্ভব নয়।

সুতরাং এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের পার্থক্য আছে। কিন্তু আসুন আমাদের যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো ভুলে যাই আর যেগুলো আমাদের উভয় ধর্মে কমন সেগুলো পালন করার চেষ্টা করি।

আপনি মনে করেন বেদ আল্লাহর বাণী। আমি মনে করি কোরআন আল্লাহর বাণী। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস আলাদা। তাই এটা নিয়ে আমরা পরে কথা

বলব। আগে যেগুলো এক সেগুলো পালন করি। অর্থাৎ যেহেতু বেদ বলছে ঈশ্বর একজন, কোরআন বলছে ঈশ্বর একজন, সুতরাং ঈশ্বর একজন। বেদ বলছে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী হিসেবে আসবেন কোরআনও বলছে নবী, সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী। কুরআন বলছে মেয়েদের পর্দা করতে হবে, বেদও বলছে করতে হবে, সুতরাং মেয়েদের পর্দা করতে হবে। এভাবে যে হুকুমগুলো আপনাদের ও আমাদের মধ্যে এক আসুন সেগুলো আগে পালন করি, বাকিগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৩। একবার একজন খ্রীস্টান বন্ধুর সাথে আমার কথা হচ্ছিল কোরআন ও বাইবেল নিয়ে। সে বলল খ্রীস্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে। আর বাইবেলেও নাকি লেখা আছে কেউ যদি খারাপ কাজ করে তার সাত বংশ এর পাপের বোঝা বহন করে। আর ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো নাকি আদি পাপের সত্যতার প্রমাণ। এর উত্তরে উক্ত বন্ধুকে কি বলা যায়?

উত্তর ঃ আপনি বাইবেলের পাপের বোঝা বহন সম্পর্কিত যে কথাটি বললেন, সেটি কোথাও লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। তবে বাইবেলের বুক অব ইজাকেল ১৬ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে, যে পাপ করবে সে মারা যাবে। বাবা তার ছেলের পাপের বোঝা বহন করবে না। খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার কাছেই থাকবে। ভাল লোকের ভাল কাজও তার সঙ্গেই থাকবে। তবে খারাপ লোক তার পথটা বদলে ভাল পথে আসলে সে মারা যাবে না।

সুতরাং বাইবেল বলছে, যে পাপ করছে সে মারা যাবে অর্থাৎ পাপের জন্য পাপী ব্যক্তিই দায়ী থাকবে। কোরআনেও একই কথা আছে। কোরআন বলছে, কোন বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবে না। আবার কোরআন যেমন বলছে তওবা করে ফিরে আসার কথা, বাইবেলও তেমনি বলছে কেউ খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে এলে পুরস্কৃত হবে।

বাইবেলের কোথাও আদি পাপের কথা বলা হয়নি। এটা বাইবেলের মতবাদ নয়। এ কথাটি এনেছে চার্চ। অধিকাংশ খ্রীস্টানদের বিশ্বাস আদম ও হাওয়া (আ)-এর নিষিদ্ধ ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল। হাওয়া আদম (আ)-কে প্রলুব্ধ করলেন সেই ফল খাওয়ার জন্য। সেই পাপের বোঝাই আমরা বহন করে চলছি।

কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ আছে। আদম কি আমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে ফল খেয়েছিলেন যে আমরা তার জন্য দায়ী থাকব? যদি আমার বাবা কাউকে খুন করেন পুলিশ কি এসে আমাকে ধরবে? যেহেতু খ্রীস্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে, তাদের উচিত তাদের দেশে এমন আইন পাস করা যে, বাবার অপরাধের জন্য ছেলেকেও শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তারা তা

কখনই করবে না। কোন দেশেই এ ধরনের আইন হতে পারে না। কারণ তা অযৌক্তিক। সুতরাং কারও আদি পাপের জন্য তার বংশধররা দায়ী থাকবে এ ধারণা অযৌক্তিক।

একজন ডাক্তার হিসেবে আমার জানা আছে, ডায়াবেটিস একটি বংশগত রোগ। তবে ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো আদি পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে এ কথা বাইবেলের কোথাও লেখা নেই। যদি এ যুক্তি সত্য ধরে নেয়া যায় যে, জেনেটিক্যালি এ রোগ পাপের বোঝা হিসেবে পরিবাহিত হচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে অনেক স্মাগলার, রেপিস্টদের সন্তানরা বুদ্ধিমান ও ভাল হয়। এটা কি কারণে হয়? এক্ষেত্রে তো উল্টো তাদের আরও খারাপ হওয়ার কথা।

প্রকৃতপক্ষে ডায়াবেটিস কোন পাপের বোঝা নয়; বরং এটি একটি পরীক্ষা। আল্লাহ এই পরীক্ষা দিয়েছেন মানুষের ধৈর্য যাচাই করার জন্য। তিনি দেখতে চান যে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি কি ধৈর্য ধারণ করে নাকি বলে যে, আল্লাহ কেন এ রোগ দিলেন, ডায়াবেটিস কেন হল ইত্যাদি? পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলেছেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

"তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যেন তিনি দেখে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।"

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। এছাড়াও কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন ভয়ভীতি রোগব্যাধি ধনসম্পদের ক্ষতি দিয়ে।

একজন স্মাগলারের ছেলেকে তার জন্য শাস্তি দেয়ার সুযোগ নেই। যদি প্রমাণ করা যায় যে, চুরি করা, ধর্ষণ এগুলো জেনেটিক্যালি পরিবাহিত হচ্ছে তখন ছেলের অপরাধের জন্য বাবাকে দায়ী করা যেতে পারে।

সুতরাং ডায়াবেটিস কোন আদি পাপের বোঝা নয় বরং এটি পরীক্ষা।

প্রশ্ন ঃ ৩৪। এমন কোন মুসলিম কি আছে যে বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কোরআন ও বাইবেল দুটোই আল্লাহর বাণী? এমনটি করা কি সম্ভব যে, পবিত্র কোরআন ও বাইবেল দুটোই মানব?

উত্তর ঃ মুসলিমরা ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিলে বিশ্বাস করে। ইসলামই একমাত্র অখ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাস যেখানে ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক। সে মুসলিম মুসলিম নয়, যে ঈসা (আ)কে বিশ্বাস করে না। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল ছিলেন তিনি মসীহ, তার জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। তিনি আল্লাহর আদেশে

জীবিতকে মৃত করতে পারতেন এবং আল্লাহর আদেশে তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করতে পারতেন। ঈসা (আ)-এর উপর আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছিল আর সেটা হল ইঞ্জিল।

যেকোন ব্যক্তিই যদি মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়ে সে বুঝতে পারবে যে, এ বাইবেল সেই ওহী নয় যা যীশু খ্রিস্টের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বাইবেল শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ বিবলোস থেকে। যার অর্থ অনেকগুলো বই। একজন খ্রীস্টান মাত্রই জানে যে বাইবেল হল অনেকগুলো বইয়ের সংগ্রহ। প্রোটেস্টেন্টদের মতে বইয়ের সংখ্যা হল ৬৬ এবং ক্যাথলিকদের মতে ৭৩টি।

মুসলিমদের মধ্যে যারা শরীয়াহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন তাদের মতে, বর্তমানে যে বাইবেল প্রচলিত তার পুরোটা আল্লাহর বাণী নয়। বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ আল্লাহর বাণী, কিছু অংশ যীশু খ্রিস্টের কথা আর কিছু অংশ ঐতিহাসিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর কিছু অংশে আছে পর্ণোগ্রাফি, পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা ও অবৈজ্ঞানিক উক্তি– যেগুলোকে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

সুতরাং বর্তমান বাইবেল সেই ইঞ্জিল নয়, যা ঈসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মূলত বাইবেল একটি মিশ্র গ্রন্থ। অতএব সামগ্রিকভাবে একে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

বাইবেল ও কোরআনের মধ্যে কতগুলো জায়গায় সাদৃশ্য আছে। মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি বলতে চাই যেহেতু আমরা জানি, ঈসা (আ)-এর ওপর আসমানী কিতাব ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল সেহেতু বাইবেলের সে কথাগুলো কোরআনের সাথে তথা সর্বশেষ আসমানী কিতাবের সাথে মিলে যায় আমরা সেগুলো মেনে নেব। আপনারা যদি ওল্ড টেস্টামেন্টে ও নিউ টেস্টামেন্টের কথা বলেন তাহলে কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট। প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোরআনকেও কেন মানদণ্ড হিসেবে নেব? এর উত্তর হল কোরআনই হল একমাত্র আসমানী কিতাব যা অপরিবর্তিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কেবল কোরআনই পাস করবে। কোরআনে কেন একটাও অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা নেই, নেই কোন ভুল।

ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার একটি গ্রন্থে কোরআনের ৩০টা বৈজ্ঞানিক ভুল দেখিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে আমি তার ৩০টি যুক্তিই খণ্ডন করেছি। আমি তাকে বাইবেলের ৩৮টি বৈজ্ঞানিক ভুল দেখালাম কিন্তু তিনি সেগুলো খণ্ডন করতে পারেননি।

কোরআন হল ফুরকান অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। বাইবেলের যে অংশগুলো কোরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেগুলোকে আমরা তথা মুসলিমরা

আল্লাহর বাণীরূপে মেনে নেব। যেমন শুরুতে ঈসা (আ) সম্পর্কিত মুসলমানদের যে বিশ্বাসগুলোর কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে কোরআন ও বাইবেলে সাদৃশ্য আছে।

কোন কোন খ্রীস্টানদের ধারণা যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুরো বাইবেলের কোথাও এ কথা নেই যে, ঈসা (আ) নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন অথবা বলেছেন, আমার উপাসনা কর, গসপেল অব জন ১৪ নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে যীশুখ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন, আমার পিতা আমার চাইতে মহান।

গসপেল অব জন ১০ নং অধ্যায়ের ২৯ অনুচ্ছেদে আছে, আমার পিতা সবার চাইতে মহান।

গসপেল অব জন ম্যাথিউ ১২নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে আছে,

আমার ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই। গসপেল অব লুক ১১ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই।

গসপেল অব জন ৫ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে আছে,

আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি এখানে বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছাকে দেখি।

যদি কেউ বলে আমি নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আল্লাহর ইচ্ছাকে দেখি, অর্থাৎ সে আল্লাহর নিকট নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে এমন একজন ব্যক্তিকে আরবিতে বলে মুসলিম। সুতরাং যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। বুক অব অ্যাকটস এর ২ নং অধ্যায়ের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে,

হে ইসরাইলের সন্তানেরা! একথাটা কোনো নাজারাথের যীশু যে তোমাদের ঈশ্বরের প্রেরিত নবী ও ঈশ্বরের আদেশে সে অলৌকিক কাজ করেছে– তোমরা তার সাথী থাকবে।

অর্থাৎ যীশু ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহতায়ালা তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির হেদায়েতের জন্য। কোরআনের সাথে বাইবেলের এ সাদৃশ্য ছাড়াও আরও সাদৃশ্য আছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় জায়গায়ই মুহাম্মদ ﷺ-এর পৃথিবীতে আসার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী আছে। বুক অব ডিউটারোনোমী ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে আছে, মুহাম্মদ ﷺ আসবেন। এছাড়াও বুক অব ডিউটারনোড়ামী ১৮ অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে বুক অব ইসায়ইয়া ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদে সং অব সলোমন ৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করে তাঁর আসার কথা বলা হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টের গসপেল অব জন ১৪ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে, গসপেল অব

জন ১৫ নং অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে, গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে ও গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২–১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, সর্বশেষ এ চূড়ান্ত নবী আসবেন, যার নাম মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

বাইবেলে অযু ও নামাযের ব্যাপারেও বলা আছে। যেমন– নামাজের অন্যতম প্রধান অংশ সেজদার কথা বলা আছে, বুক অব জেনেসিস বুক অব জোসেয়া ও গসপেল মেথিউতে।

ইসলামে যাকাতের কথা বলা আছে, বাইবেলও তেমনি দান করার কথা বলা আছে। বুক অব শামস ৮৪ নং অধ্যায়ের ৪ থেকে ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সে লোকগুলো আশীর্বাদ প্রাপ্ত যারা বাক্কা শহরে যায়।" অর্থাৎ হজ্জের ব্যাপারেও বাইবেলে ইঙ্গিত আছে। পবিত্র কোরআনে কিছু জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলো বাইবেলেও নিষিদ্ধ।

পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩ নং, সূরা বাকারার ১৭৩ নং সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমাদের জন্য হারাম খাবার হল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে।"

বাইবেলেও এ জিনিসগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব জেনেসিস, বুক অব লেভিটিকাস ও বুক অব ডিউটারোনোমীতে রক্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুক অব ডিউরোনোমী ১৪ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে ও বুক অব ইসাইয়া ৬৫ নং অধ্যায়ের ২–৫ নং অনুচ্ছেদে আছে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব অ্যাক্টস ১৫ নং অধ্যায়ের ২ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রাণীগুলো জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও বাইবেলে এ ধরনের আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। ইসলামী শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য নিয়ম হল–

মহিলাদের মাথা ঢাকতে হবে পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে, ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে এবং পুরুষ বা মহিলা কেউই বিপরীত লিঙ্গের মত পোশাক পরতে পারবে না। বাইবেলের বুক অব ডিউটারোনোমী ২২৫ নং অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পুরুষরা এমন কোন পোশাক পরতে পারবে না যেটা মেয়েদের মত হয় এবং মেয়েরাও পুরুষদের পোশাক পরবে না। এরকম পোশাক যারা পরে তারা সবার ঘৃণার পাত্র। সুতরাং বাইবেলেও বিপরীত লিঙ্গের ন্যায় পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফার্স্ট টিমোথীর ২য় অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহিলারা পোশাক পরবে ভদ্রতার সাথে, তারা শরীর ঢেকে রাখবে, শালীন পোশাক পরবে ও দামী গহনা তথা স্বর্ণ বা মুক্তার কিছু পরবে না।

ফার্স্ট কোরিথিয়ানুসের ১১ নং অধ্যায়ের ৫ থেকে ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'যে মহিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় তার মাথা ঢাকে না, সে নিজেকে অসম্মান করে, তার মাথার চুল ছেটে ফেলতে হবে।' অথচ কোরআন বা হাদীসে এত কঠিনভাবে কোথাও বলা হয়নি যে মাথা না ঢাকলে তা কামিয়ে দিতে হবে। আপনারা মা ম্যারীর ছবি বা গীর্জার নানদের দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, মহিলাদের কিভাবে পোশাক পরতে হবে। মুসলিম মহিলারাও এভাবে নিজেদের পুরো শরীর ঢেকে রাখে, শুধু মুখ ও হাত কবজি পর্যন্ত খোলা থাকে। এভাবে আরও সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব। এজন্য আমার মতে, খ্রীস্টান বলতে যদি তাকে বুঝায় যে যীশু খ্রিস্টের অনুসরণ করে তাহলে মুসলিমরা খ্রীস্টানদের চেয়ে অনেক বেশি খ্রীস্টান।

বাইবেলে মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব একিসিয়ান্স ৫ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদ ও বুক অব প্রোকাইস ২০ নং অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তোমরা মদ পান করো না। অথচ দেখুন মুসলিমরা মদ না পান করলেও খ্রীস্টানদের অনেকেই মদ পান করে। মুসলিমরা খাৎনা দেয়। গসপেলে বলা আছে যীশু খ্রিস্টের খাৎনা দেয়া হয়েছিল অষ্টম দিনে। সুতরাং খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে খ্রীস্টানদেরও খাৎনা দেয়ার কথা, কিন্তু অধিকাংশ খ্রীস্টানরা খাৎনা দিচ্ছে না, মুসলিমরা এ হুকুমটি অনুসরণ করছে।

সুতরাং পুরো বাইবেলও মহান ঈশ্বরের বাণী নয় বরং এর অংশবিশেষ মহান ঈশ্বরের বাণী, যেটা কোরআনের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর সে অংশটুকু মেনে চলতে মুসলিমদের কোন সমস্যা নেই। যদি খ্রীস্টানরাও সে অংশটুকু মেনে চলে, তবেই মুসলিম ও খ্রীস্টানরা এক হতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৫। আমি কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি। সেখানে লেখা আছে, তাওরাত, যবুর, ইনজীল এগুলো আল্লাহর বাণী, "আল্লাহর বাণীকে কেউ বদলাতে পারবে না" এবং আরেক জায়গায় নবী মুহাম্মদ ﷺ কে বলা হয়েছে, "যদি এ কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে যারা তোমার আগে আসমানী কিতাব পেয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর।" আমার মনে হয়, এরা ইহুদী ও খ্রীস্টান কোরআনের এ আয়াতগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, যদি তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল আল্লাহর কিতাব হয় কেউ তাকে বদলাতে পারবে না। আবার কোরআন ও বাইবেলের মধ্যেও বেশ সাদৃশ্য আছে। আমার প্রশ্ন হল, এমনটি কি হতে পারে যে, পবিত্র বাইবেলে কোন পরিবর্তন হয়নি?

উত্তর ঃ প্রথমত পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে যে, 'তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল এগুলো হল আল্লাহর বাণী।' এগুলো আসমানী কিতাব।

তাওরাত নাযিল হয়েছিল মুসা (আ)-এর উপর, যাবুর দাউদ (আ)-এর উপর, ইঞ্জীল ঈসা (আ)-এর উপর এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআন নাযিল হয়েছে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর।

দ্বিতীয়ত, 'আল্লাহর বাণীকে বদলানো যায় না এ কথাটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআনের জন্য প্রযোজ্য। তবে এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো না পড়লে এ বিষয়টি জানা সম্ভব নয়। সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

"আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম বা সমতুল্য আয়াত আনি।"

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে, আগের যে ওহী এসেছিল অথবা আগে যে ওহীগুলো বিস্মৃত হতে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর চেয়ে উত্তম আয়াত আনা হবে।

অন্যদিকে কোরআন হল সর্বশেষ ওহী। সূরা মায়িদাহ-এর ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম।"

সুতরাং সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কোরআনে কোন কিছু যোগ করা বা বাদ দেয়া যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহর বাণীকে বদলানো যাবে না কথাটি কোরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রশ্ন হতে পারে যে, কোরআন কেন সর্বশেষ নাযিল হল? কেউ যদি বলে যে, 'আমি ডাক্তার হব অতএব আমাকে স্কুল-কলেজ রেখে প্রথমেই কেন মেডিকেলে ভর্তি করলে না।' সেটা কি যৌক্তিক হবে? কখনই নয়। তেমনি আগের যুগের আসমানী গ্রন্থগুলোতে ইসলামী শরীয়াহর মূলনীতি এক ছিল তা হল তৌহিদ, নামাজ কিন্তু শরীয়াহর অন্যান্য কিছু প্রয়োজন সাপেক্ষে ভিন্ন ছিল।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞানের আলোকে আসমানী কিতাব কোরআন নাযিল করলেন ১৪০০ বছর আগে এবং এ কিতাবকে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ কিতাব হিসেবে ঘোষণা দিলেন। যেটা সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম।"

আর কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বাণী হত তাহলে এতে অনেক অসঙ্গতি থাকত। এ কথাটাই সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

অর্থ ঃ "তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত তাহলে এতে অনেক অসংগতি থাকত।"

তৃতীয়ত, আপনি বললেন, কোরআন আল্লাহ তায়ালা নবী ﷺকে বলছেন যদি তোমার এ বাণীর ব্যাপারে ইহুদী খ্রীস্টানদের জিজ্ঞাসা কর।

এখানে আপনি বুঝতে ভুল করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে আল্লাহ তায়ালা নবী ﷺকে বলছেন, 'ইহুদী খ্রীস্টানদের বল যে, তোমরা যদি কোরআন বিশ্বাস না কর তাহলে তোমাদের ধর্মগ্রন্থে দেখ।' কারণ, কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট যেখানে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের অংশ বিশেষ থাকবে।

এবার আপনার এ প্রশ্নটিতে আসা যাক যে, এমনকি সম্ভব যে 'বাইবেলের কোন পরিবর্তন হয়নি' বাইবেল যদি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ঈশ্বরের বাণী হত তাহলে এতে ভুল থাকার কথা নয়। অথবা যুক্তি যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বাইবেলে অনেকগুলো ভুল আছে। এখানে কিছু ভুলের নমুনা দেয়া হল। গসপেল অব ম্যাথিউ ৪ নং অধ্যায়ের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে পৃথিবী সমতল। বুক অব জেনেসিস ১ নং অধ্যায়ের ১৬–১৯ অনুচ্ছেদে বিশ্বজগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ আছে আগে আলো ছিল না ঈশ্বর সেখানে আলো দিলেন, অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হল এরপর চতুর্থ দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র। আলোর উৎসের আগে আলো আসা সম্ভব নয়, এটা অযৌক্তিক। এরপর বলা আছে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে ও গাছপালা চতুর্থ দিনে। পৃথিবী হল সূর্যের একটি অংশ।

যদি বলা হয় যে, পৃথিবী সূর্যের আগে এসেছে, সেটা অযৌক্তিক হবে। বুক অব জেনেসিসের একই অংশে বলা হয়েছে যে, মহান ঈশ্বর দুটো আলোকে সৃষ্টি করেছেন। বড় আলোটা হল সূর্য যা দিনকে শাসন করবে। আর ছোট আলোটা হল চাঁদ যা রাতকে শাসন করবে। বাইবেলের কথাগুলো এমনভাবে বলা আছে, যেটা পড়লে মনে হয় চাঁদের আলোটা তার নিজস্ব আলো। সূরা ফুরকানের ৬১ নং

আয়াতে কোরআন বলছে, সূর্যের আলো তার নিজস্ব ও চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত। বৈজ্ঞানিকভাবে দ্বিতীয়টি সত্য। প্রকৃতপক্ষে চাঁদের আলো নিজস্ব আলো এটা একটা প্রাচীন ধারণা। এ ধরনের অনেকগুলো ভুল আছে বাইবেলে।

এছাড়াও আছে অনেক অসঙ্গতি। এসব থেকে স্পষ্ট যে বাইবেল অপরিবর্তিত নেই। অর্থাৎ এটা ঈশ্বরের বাণী নয়।

প্রশ্ন ঃ ৩৬। আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টের একজন ছাত্র। আমাদের ট্রেনিং এর সময় অ্যালকোহল সার্ভ করতে হয়। ইসলামে কি এর অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ ইসলামে অ্যালকোহল পরিবেশন করা হারাম। কোরআন ও হাদীসে অ্যালকোহল পান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একটি হাদীস। অ্যালকোহলের সাথে সম্পর্কিত আছে যেখানে নবী করীম ﷺ ১০ ধরনের মানুষের একটি তালিকা করেছেন এবং বলেছেন এরা অভিশপ্ত। এদের মধ্যে আছে যে লোক অ্যালকোহল তৈরি করে, যে লোকের জন্য এটা তৈরি করা হয়, যে লোক এটা বহন করে, যে লোক এটা বিক্রি করে, যে লোক এটা থেকে লাভ গ্রহণ করে, যে লোক এটা পরিবেশন করে, যে লোকের জন্য পরিবেশন করা হয়। সুতরাং অ্যালকোহল পরিবেশন করা নিষিদ্ধ।

অতএব আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে বলতে পারেন যে, অ্যালকোহল নিষিদ্ধ এটা পরিবেশন করা যাবে না। সেটা সম্ভব না হলে পানীয়টা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। সেটাও সম্ভব না হলে পেশা পরিবর্তন করাই উত্তম।

এমন কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টে আপনার চাকরি করা যাবে না, যেখানে অ্যালকোহলই হল আয়ের প্রধান মাধ্যম। এমন জায়গায় আপনি অ্যালকোহল পরিবেশন করতে পারবেনই না; বরং সেখানে আপনার চাকরিও করা যাবে না। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি অ্যালকোহল আয়ের অনেকগুলো উৎসের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উৎস হয় সেখানে আপনি অ্যালকোহল ছাড়া সংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারেন। আপনি এয়ারলাইন্সে চাকরি করতে পারেন, তবে এয়ার হোস্টেজের কাজ ছাড়া। কারণ, এয়ার হোস্টেজের যাত্রীদের জন্য অ্যালকোহল পরিবেশন করতে হয়।

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াহ্র হুকুম হচ্ছে যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার চাকরি করতে হয় যেখানে কিছু হারাম কাজ হয় এবং আপনার পক্ষে সেটাকে পরিবর্তন করার সুযোগ নেই– সেখানে নিজেকে হারাম কাজের সাথে না জড়ালে আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার আয় হালাল।

সুতরাং আপনি আপনার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালকের সাথে হিকমাহ্র সাথে কথা বলে ড্রিঙ্কস পরিবেশনের ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের পরিবর্তে অন্য কোন হালাল পানীয় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ৩৭। কিছুদিন আগে ডেনমার্কে আমাদের নবীজী ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এ ধরনের অপমানজনক ঘটনা যখন ঘটে তখন আমাদের কি করণীয়?

উত্তর ঃ ২০০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি ড্যানিশ কাগজে নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে ১২টা কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এছাড়া এর আগে সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিনদের মত ব্যক্তিরাও এ ধরনের ঘটনার অবতারণা করেছিল। আমেরিকাতেও নবীজী ﷺ -কে অবমাননা করে লেখালেখি হয়েছে।'Time' ম্যাগাজিনের ১৯৬৯ সালের এপ্রিল সংখ্যায় একটি রিপোর্টে এসেছিল যে, ১৮০০ থেকে ১৯৫০ এ দেড়শ বছরের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজারের বেশি বই লেখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন একটা বই লেখা হয়েছে। নাইন ইলেভেনের পরে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা বইয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রতিদিন কয়েকটা করে বই লেখা হচ্ছে। অসংখ্য আর্টিকেল ছাপানো হচ্ছে। মিডিয়াতেও ইসলাম বিরোধী প্রচারণা বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হল আমরা মুসলমানরা এর জবাব কিভাবে দেব? অর্থাৎ এর প্রতিবাদ কিভাবে করব?

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, নবীজীর অবমাননা এ ধরনের অপমানজনক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পদ্ধতিকে ৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমঃ মিডিয়ায় উত্তর দেয়া অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়া, খবরের কাগজ, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি ব্যবহার করে অপপ্রচারের ভুল জবাব দেয়া বা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়া। এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর যেকোন দেশেই অপপ্রচারের ঘটনা ঘটুক না কেন তার জবাব অন্য যেকোন প্রান্ত থেকেই দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ঃ সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ জানানো। এ ধরনের প্রতিবাদও পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে হতে পারে।

তৃতীয়ঃ আইনগত ব্যবস্থা তথা কোর্টে মামলা করা। এ পদ্ধতি কেবল সে দেশেই ফলপ্রসূ হতে পারে যে দেশে আইন ব্যবস্থা কড়া এবং দীর্ঘসূত্রিতা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হল আমেরিকান মুসলিম অর্গানাইজেশন কেয়ারের একটি ঘটনা। একবার বিখ্যাত জুতো কোম্পানি নাইক (NIKE) এমন এক ধরনের জুতো বের করল যার পেছনের দিকে লেখাটিকে আরবী হরফের আল্লাহ লেখার মত মনে হয়। যেটা ইসলামের জন্য অবমাননাকর। এ কারণে কেয়ার নাইকের (NIKE) বিরুদ্ধে কেস করেছিল। তবে সে কেস কোর্টে যাওয়ার আগেই নাইক (NIKE) কেয়ারের সাথে সমঝোতা করে এবং প্রায় ১৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দেয়। এ টাকাটা পরে কেয়ার জন মুসলমানদের সেবামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করে।

চতুর্থঃ অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেয়া। যেমন ব্যবসায়িক চাপ। এ পদ্ধতিও সবদেশে কাজে নাও লাগতে পারে। যে দেশ অপপ্রচারের সাথে জড়িত যদি সে দেশের প্রেসিডেন্ট এ কার্যক্রমের নিন্দা না করে সমর্থন করে, তবে সে দেশের পণ্য বর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পণ্যসামগ্রী বর্জন করা হয়েছিল। ফলে আমেরিকার অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ ধরনের পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে কেবল তখনই যখন একটা বড় সংখ্যক দল এক সাথে পণ্য বর্জন করে।

পঞ্চমঃ রাজনৈতিক চাপ। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর প্রধানরা একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধানকে প্রতিবাদ জানাতে পারে। তারা বলতে পারে, আপনাদের অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে নাহলে আমরা আপনাদের দেশ থেকে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেব এ ধরনের কোন কথা।

ষষ্ঠঃ শক্তি প্রয়োগ করে। যেমন কুশপুত্তলিকা পুড়ানো, পতাকা পোড়ানো, অ্যামবেসিতে পাথর মারা, ভাঙচুর চালানো, এমনকি বোমা ফাটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। প্রথম পাঁচটা পদ্ধতিতে কোন সমস্যা নেই। কারণ সেগুলো হল বাক স্বাধীনতার ব্যবহার। তবে ষষ্ঠ পদ্ধতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন যদি ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। যেমন পতাকা পুড়ানো ইত্যাদি। তবে সেটা এমন হয় যে, সেই দেশের নিরীহ মানুষকে ধরে আটকে রাখা হল বা হত্যা করা হল, ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। ইসলামী দেশে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে ধরে বিচার করা হলে এটা ভিন্ন ব্যাপার। নিরীহ মানুষকে হত্যার ব্যাপারে কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে এসেছে, 'যদি কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে অথচ সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা খুনের অপরাধে অপরাধী নয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যদি কাউকে বাঁচানো হয় তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।

ডেনমার্কের একটি স্থানীয় পত্রিকায় যখন প্রথম কার্টুনগুলো প্রকাশিত হয়েছিল তখন সে দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূতগণ একত্রিত হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে এবং তিন সপ্তাহ পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু ড্যানিশ প্রাইম মিনিস্টার বিষয়টিকে হালকাভাবে নিলেন এবং কোন পদক্ষেপ নিলেন না।

তিন মাস পর ২০০৬ এর ২০শে জানুয়ারি একই কার্টুন ছাপানো হল নরওয়েতে। চারটি পত্রিকায় ছাপানো হল। এরপর ছাপানো হল জার্মানীতে, তারপর হাঙ্গেরীতে। প্রথম থেকেই মুসলিম বিশ্বের স্থানে স্থানে এ কার্টুনের প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কার্টুনগুলো বিভিন্ন দেশে ছাপানো হচ্ছিল তখন সমগ্র মুসলিম একযোগে এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। মুসলিম বিশ্বে এ

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল উপরে আলোচিত ৬টি পদ্ধতিতেই। মিডিয়া, ইন্টারনেটে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এসব স্থানে এর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ মিছিলের মাধ্যমে। সে সময় সৌদি আরবের পাঁচশত-এর বেশি আইনজীবীদের একটি আন্তর্জাতিক কমিটি ঘোষণা করেছিল যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করা হবে।

ডেনমার্কের ওপর অর্থনৈতিক চাপও সৃষ্টি করা হয়েছিল। ডেনমার্কের আয়ের অন্যতম উৎস হল দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী। কুয়েত একাই প্রতি বছর ১৭০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য ডেনমার্ক থেকে আমদানী করত। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এ আমদানীর পরিমাণ হল প্রতি বছর ৮০০ মিলিয়নেরও উপরে। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের স্বদেশ একযোগে ডেনমার্কের পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এভাবে যখন ডেনমার্কের ব্যবসায়িক ক্ষতি হল তখন ডেইরি ফার্মের মালিকরা মিলিত হয়ে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ও প্রিন্টমিডিয়ার কাছে গেল এবং ব্যবস্থা নিতে বলল। প্রিন্ট মিডিয়া তখন ক্ষমা চেয়েছিল। ইংরেজি, আরবি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে তাদের ক্ষমা চাওয়ার ভাষা স্পষ্ট ছিল, যদিও ড্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে এ ক্ষমা চাওয়ার ভাষা জোরালো ছিল না। দোষী পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক বলল যে, 'আমরা যে কার্টুন ছাপিয়েছি তা ডেনমার্কের আইনে অবৈধ নয়, তবে যেহেতু এতে মুসলিম বিশ্ব আহত হয়েছে এ জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি।'

অর্থাৎ অনেকটা শর্ত আরোপ করে ক্ষমা চাওয়ার মত। যেন, কোন দেশে ধর্ষণ অবৈধ না বিধায় সে দেশের কোন লোক কোন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করে বলল যে, আমাদের দেশে ধর্ষণ বৈধ কিন্তু আপনি যেহেতু কষ্ট পেয়েছেন সেহেতু আমি দুঃখিত।

এ ধরনের কোন অযৌক্তিক নিয়ম তৈরি করার কোন সুযোগ নেই। যা অবৈধ তা সবার জন্যই অবৈধ। যা ক্ষতিকর তা সবার জন্যই ক্ষতিকর। সেটা বৈধ নাকি অবৈধ তার ওপর ভিত্তি করে ক্ষতির পরিমাণ কমবেশি হবে না।

ডেনমার্কের উক্ত ঘটনায় রাজনৈতিক চাপও দেয়া হয়েছিল। যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ঘটনার সাথে রাষ্ট্রদূতরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে পদ্ধতিতে যখন কাজ হল না তখন সাথে সাথেই সৌদি আরব তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো বলল যে, তাদের দেশে ডেনমার্কের অ্যামবেসী দরকার নেই। এরপর ডেনমার্ক ক্ষমা চেয়েছিল।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। যেমন– ইন্দোনেশিয়ায় ডেনমার্কের অ্যামবেসী ভাঙচুর হয়েছে, অ্যামবেসীতে পচা ডিম

ছোঁড়া হয়েছে, ইরাকে ডেনমার্কের পতাকা পুড়ানো হয়েছে। প্রতিবাদের এ পদ্ধতি যদিও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ছিল, তবে কিছু জায়গায় যেমন– ফিলিস্তিনে একজন জার্মান নাগরিককে ড্যানিশ ভেবে আটক করা হয়েছিল। যেটা প্রতিবাদের বৈধ পদ্ধতি নয়। যদিও পরবর্তীতে তারা উক্ত লোকটির সঠিক পরিচয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে ছয়টি পদ্ধতিতেই প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আমেরিকায় কার্টুনগুলো ছাপানো হয়নি এবং ইংল্যান্ড ডেনমার্কের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। তারা বলেছে যে, বাকস্বাধীনতা থাকতে পারে কিন্তু কোন ধর্মের অবমাননা করার সুযোগ নেই। আমেরিকাও নিন্দা করেছে। কারণ, তারা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তারা দেখেছে যে, এ ধরনের ক্যারিকেচারের কারণে অনেক টাকা লোকসান হচ্ছে।

সুতরাং নিরীহ মানুষের ক্ষতি হয় এ ধরনের কোন কাজ ছাড়া ছয়টি পদ্ধতিতেই প্রতিবাদ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৩৮। যীশু খ্রীস্ট বলেছেন যে, তোমরা শত্রুকে ভালবাস, প্রতিবেশীকে ভালবাস। এভাবে শ্রী শ্রী রবিশংকর ও অন্যান্য ধর্মীয় গুরুরাও ভালবাসার কথা প্রচার করছে। এ কারণে দিনে দিনে তাদের অনুসারীর সংখ্যাও বাড়ছে। আমাদের নবী ﷺ কি ভালবাসার কথা প্রচার করেছেন?

উত্তর ঃ যীশু খ্রীস্ট ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আপনারা দেখবেন ধর্ম পালনের দিক দিয়ে খ্রীস্টানদের থেকে মুসলমানদের সংখ্যাটা বেশি। খ্রীস্টানদের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ১২০ কোটি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে গণনা করলে ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের সংখ্যা বেশি পাওয়া যাবে। সুতরাং কতজন খ্রীস্টান যীশু খ্রীস্টের এ কথা মেনে চলছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যদি তারা তাদের ধর্মের কথা মেনেই থাকত তাহলে বিশ্বব্যাপী তাদের যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক অত্যাচার সেটা থাকত না। শ্রী শ্রী রবিশংকরও ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের নবীজী ﷺ শুধু ভালবাসার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তিনি তাঁর কথা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তির আশেপাশের চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর কেউ না খেয়ে থাকে সে ভরাপেটে ঘুমানোর অধিকার রাখে না। কি চমৎকার শিক্ষা। অথচ আপনি অমুসলিম ও সিউডো মুসলিমদের মিডিয়াগুলোতে দেখলে লক্ষ্য করবেন যে, তারা ইসলামের ন্যায়বিচারের কথা হয়ত ঘুরিয়ে, পেচিয়ে পরিবেশন করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রতিবেশীদের ভালোবাসার কথা বলেছেন তা ন্যূনতম প্রচার করছে না। তাদের এ আচরণে মনে হতে পারে যেন নবী ﷺ ভালোবাসার কথা প্রচারই করেননি (নাউযুবিল্লাহ)।

শ্রী শ্রী রবীশংকর শুধু এ পুস্তকের মাধ্যমে ভালোবাসার কথা প্রচারেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। উল্টো ইসলামকে নিয়ে যে বুকলেকটি তিনি প্রকাশ করেছেন তা

রীতিমত অবমাননাকর। ইসলামে যাকাত ফরয করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "ধনীদের সম্পদে আছে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার।" এ বিষয়গুলো কখনও মিডিয়াতে ফোকাস হয় না। মিডিয়াতে বরং ইসলামী শরীয়াহতে ধর্মের অবমাননাকর যে শাস্তি নির্ধারিত আছে সেটা এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন ইসলাম কি নির্মম! সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তাহলে হয় তাকে হত্যা কর বা ক্রুশবিদ্ধ কর বা তার হাত পা কেটে ফেল অথবা নির্বাসন দাও।" একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কোন ধর্মদ্রোহীর জন্য এটাই শাস্তির বিধান। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা এ ধরনের শাস্তির কথা শুনে আঁতকে উঠে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যা দেয়।

যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে সন্ত্রাসের কোন কথা নেই। কারণ কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির মায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তার বদনাম করে, তার ক্ষতি করে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অধিকার বলেই প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে রেগে যাবে কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা নিতে চাইবে। ঠিক তেমনি একজন মুসলিম ব্যক্তি কোরআনের হুকুম অনুযায়ী তার মায়ের চেয়েও বেশি আল্লাহর ও তার রাসূলকে বেশি ভালবাসে। বিধায় আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইবে। এটাই যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক। অন্য কোন ধর্মানুসারীরা তাদের নবী-রাসূলকে ভালবাসে না সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমরা তাদের নবী ﷺ-কে তাদের মা, বাবার, স্ত্রী সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

সুতরাং আমাদের নবী ﷺ ভালবাসার কথা শুধু বলেন নি; বরং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার কৌশলীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৩৯। একবার এক কোম্পানি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখা জুতো বের করলে পরে মুসলিমরা প্রতিবাদ জানালো– জুতার দোকানে পাথর ছুঁড়ে মেরে, হরতাল করে, আমার প্রশ্ন হল এভাবে স্ট্রাইক করলে বা হরতাল করলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা এর সাথে জড়িত নয়, তাহলে এ ধরনের কাজে কি ইসলামে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কিভাবে ইসলামের প্রতি অবমাননাকর কোন ঘটনার প্রতিবাদ করা যায়? সেখানে ছয়টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আপনি যে ঘটনা উল্লেখ সেটা হল ছয় নম্বর পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনায় প্রথমে নন ভায়োলেন্ট পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করা দরকার। যেমন– মিডিয়ার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানানো যেতে পারে। সে কোম্পানির জুতো না কিনে অর্থনৈতিক চাপ

সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ সকল পদ্ধতিতে কাজ না হলে তখন ষষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে যারা দোষী নয় তাদের দোকান ভাঙ্গা বা দোকানে পাথর ছুঁড়ে মারা এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। হরতাল করার মাধ্যমে যেহেতু এখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেহেতু হরতালও বৈধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ৪০। আপনি যে ছয়টি পদ্ধতির কথা বললেন, নবীজী ﷺ তার বিরুদ্ধে অপবাদ বা বদনাম এর প্রতিবাদে উক্ত পদ্ধতির একটিও ব্যবহার করেননি। কিন্তু তথাপি ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের কি ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ বা নবীজী ﷺ-এর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরকার আছে?

উত্তর ঃ এখানে দুটো বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ নবীজী ﷺ কোন কাজ না করার মানে এ নয় যে তা আমরা করতে পারব না। নবী ﷺ যেটা করেছেন সে কাজটাই কেবল বৈধ। যেটা তিনি বলেছেন সেটা সুন্নত এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরজ। কিন্তু নবী ﷺ যেটা করেননি সেটা নিষিদ্ধ এমন কোন নিয়ম নেই। কেউ যদি বলে আমি মাইক ব্যবহার করব না, কারণ নবীজী ﷺ ব্যবহার করেননি, তাহলে সেটা অযৌক্তিক হবে। কারণ নবীজী ﷺ এর সময় মাইক আবিষ্কার হয়নি। তবে নবী ﷺ-এর যদি এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় যেখানে তিনি মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে সেটা হারাম। অনুরূপ নবী ﷺ মেডিকেলে ভর্তি হননি বলে কি আমরা ভর্তি হতে পারব না?

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদের উপায় নির্ভর করে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর। আর নবী করীম ﷺ কে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে আনিত অবমাননাকরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নবী করীম ﷺ মক্কায় থাকা অবস্থায় এর প্রতিবাদ না করার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে না দেয়া। আরেকটা কারণ ছিল, তার অপরিসীম দয়া। পরবর্তীতে মহানবী ﷺ যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন তখন প্রতিবাদের শক্তি মুসলমানদের সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মহানবী ﷺ অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন– মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কাফেরদের শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি; বরং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। এর চেয়ে বড় মহত্তের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধের অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তা ভিন্ন কথা। কিন্তু নবীজী ﷺ-এর বিরুদ্ধে আনিত অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। তিনি নিজে ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু খলিফার জন্য এ অপরাধের শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক। যেমন– একজন বিচারক যদি তার নিজের বাসায় চুরির অপরাধে চোরকে ক্ষমা

করে দেন, দিতে পারেন কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় কোন চোরের চুরি প্রমাণিত হলে উক্ত চোরের শাস্তি বিধান করা তার জায়েয।

এছাড়া নবী করীম ﷺ-এর সাহাবারা যারা দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। যেমন- ওমর (রা) বিভিন্ন সময়ে নবীজী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জবাব দিতে চেয়েছিলেন আঘাতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে নিজের ক্রোধের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই সর্বোত্তম ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমাদের উচিৎ এ মহৎ দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলা।

কোন অন্যায় দেখলে আমাদের নবী ﷺ-এর হাদীস অনুসারে সম্ভব হলে হাত দিয়ে ঠেকাতে হবে সেটা না পারলে কথা দিয়ে বিরত রাখতে হবে আর সেটাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। আর শেষটা হল দূর্বলতম ঈমানের পরিচয়। সুতরাং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করলে তাকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হলে, ইসলামকে হেয় করা হলে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য প্রতিবাদ করাটা আরও জরুরি। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতিভেদে উপরিউক্ত ছয়টা পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ৪১। সূরা আসরে একজন মুমিনের যে মানদণ্ড দেয়া আছে তার মধ্যে একটি হল মানুষকে সততা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। আমার প্রশ্ন হল এখানে প্রকৃত অনুবাদটি মানুষকে উপদেশ দেয়া হবে নাকি নিজে সততা ও ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনের সূরা আসরে বেহেশতে যাওয়ার মানদণ্ডের মধ্যে ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার পাশাপাশি মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়ার কথা বলা আছে। সুতরাং বেহেশতে যেতে হলে সৎকর্ম তো করতে হবেই সাথে সাথে সৎ কাজের ও ধৈর্যের উপদেশও দিতে হবে। তবে নিজে সৎ না হয়ে উপদেশ দেয়া যাবে না, আবার উপদেশ না দিয়ে শুধু সৎকর্ম করলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। যদি আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ ৪২। কিছুদিন আগে আপনার একটি লেকচার কনসেপ্ট অব গড ইন মেজর রিলিজিয়নস্ এর ভিডিও সিডি একজন অমুসলিমকে দেখেছিলাম। তিনি একজন প্রফেসর। তিনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যে, প্রত্যেক ধর্মই বলছে ঈশ্বর দয়ালু। কিন্তু দেখা গেল একটি দিনে যখন মুসলমান, হিন্দু, খ্রীস্টানরা নিজ নিজ নিয়মে ঈশ্বরের পূজা করছে এবং কিছু উপজাতি পূজা করছে সূর্যের। তখনই আবার সুনামীর মত বিপর্যয় হয়ে

যখন হাজার মানুষ মারা গেল। তাহলে আমরা কোন ঈশ্বরের পূজা করব? এ প্রশ্নের জবাব আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ সকল ধর্মেই বলা হয়েছে, ঈশ্বর দয়ালু। কিন্তু ইসলামে ঈশ্বরকে শুধু দয়ালুই বলা হয়নি সাথে বলা হয়েছে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

"কারও উপর আল্লাহ অণুপরিমাণও অবিচার করেন না।"

অর্থাৎ দয়ালু হবার পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচারক। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি যদি কাউকে ধর্ষণ করে তাহলে ন্যায়বিচারের দাবি হল ধর্ষকের শাস্তি হতে হবে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ষণের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ইহকালের ধর্ষককে যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে ধর্ষিতার ওপর ইনসাফ হবে না। তবে পরকালে আল্লাহ যখন তাঁর অসীম (দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক) জ্ঞানের আলোকে বিচার করবেন, মানুষের জীবনের সমগ্র চিত্র সম্পর্কে তার সামগ্রিক জ্ঞান থাকায় তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ধর্ষিতাও যে ক্ষতিপূরণ পাবে এতে সন্দেহ নেই।

এখন সূরা মূলক এর ২নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ ঃ "তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।"

সুতরাং সুনামির ঘটনাটার দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এটা কারও জন্য পরীক্ষা এবং কারও জন্য শাস্তি। হতে পারে এটা ভাল মানুষের জন্য পরীক্ষা আর খারাপ মানুষের জন্য শাস্তি। আবার খারাপ মানুষের জন্যও এটা পরীক্ষা আবার হতে পারে। ঠিক তেমনি যদি কোন ভাল কিছু সংঘটিত হয়, সেটি কারও জন্য পরীক্ষা কারও জন্য পুরস্কার হতে পারে। খারাপ বা ভাল উভয়ের জন্য এটা পরীক্ষা হতে পারে অথবা হতে পারে– ভাল মানুষের জন্য একটি পুরস্কার।

পৃথিবীতে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং সুনামিতে আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছে– তার মধ্যে ভাল খারাপ সব মানুষই থাকতে পারে– তাদের পৃথিবীতে প্রদত্ত পরীক্ষার সময় শেষ। এমনটি ভাবার সুযোগ নেই– যে এটি শুধু শাস্তিই হতে হবে। যারা ভাল ছিল তাদের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা সুনামিতে ইন্তেকাল করেছে। আর যারা খারাপ ছিল হতে পারে

দুনিয়ায় থাকতেই তাদের শাস্তি দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথবা হতে পারে তাদেরও সময় শেষ।

দুনিয়াতে কোন পরীক্ষার কথা আপনারা চিন্তা করুন। তিন ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলে কি করা হয়? খাতা নিয়ে নেয়া হয়। এখানে কারও এটা ভাবার সুযোগ নেই যে, শাস্তিস্বরূপ তার খাতা নিয়ে নেয়া হয়েছে; বরং খাতা নিয়ে নেয়ার কারণ সময় শেষ। এখন পরীক্ষক যেমন খাতাগুলো দেখে ফলাফল নির্ধারণ করবেন তেমনি আল্লাহও পরকালে মানুষের আমলনামা দেখে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম দেবেন।

এখন সুনামিতে যে ব্যক্তি মারা গেল, তার পরিবারের জন্য এটি এমনি বিপর্যয় এবং একই সাথে একটি পরীক্ষা। যদি কোন পরিবারের ছোট একটা ছেলে মারা যায়। তাহলে এটা হতে পারে উক্ত পরিবারের মা-বাবার জন্য পরীক্ষা এভাবে যে, তারা ধৈর্য ধারণ করে কিনা? অথবা পরিবারটি যদি ধনী ও অহংকারী হয় তাহলে এটা হবে পরিবারটির জন্য একটি শাস্তি। এভাবে যে ধন সম্পদ তাদের সন্তানকে বাঁচাতে পারল না আর ঐ সন্তানের হিসেব ও পুরস্কার আলাদা ব্যাপার। পরীক্ষা যত কঠিন হবে, পুরস্কারও বেশি হবে। বি. এ পাশ করা সহজ কিন্তু এম. বি. বি. এস. পাস করা কঠিন।

পৃথিবীতে আল্লাহ সবাইকে সমান সময় দেন না। কেউ বাঁচে ১০ বছর, কেউ ২৫ বছর, কেউ ৫০ বছর। এ সময়ের মধ্যে সে কি আমল করল ও কতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল এটার ওপর ভিত্তি করে হবে ন্যায়বিচার।

সুতরাং সুনামি হলেই যে ঈশ্বর দয়ালু হবেন না এটা ভাবার সুযোগ নেই। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল এ ধরনের বিপর্যয় দেখে হতাশায় পড়ে অর্থাৎ তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

সুনামি জাতীয় ঘটনাগুলো আল্লাহর নিদর্শনের হতে পারে। মানুষকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কত অসহায় ও একই সাথে মানুষ যে কি পরিমাণ নিয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছে মানবজাতির মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। আমেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তানে যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে, আল্লাহর ক্যাটরিনা নামক ঘূর্ণিঝড় দিয়ে আমেরিকাতে তার চেয়েও বেশি সম্পদের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও কিছু করতে পারেনি। পবিত্র কোরআনের সূরা ফুসসিলাতের ৫৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। "তাদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করব, বিশ্ব জগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এটাই সত্যি।"

অতএব আল্লাহর এ নিদর্শন দেখে আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে আরও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ ৪৩। ঘরের ভিতর কোন ইসলামী বক্তব্য উপস্থাপন করতে গেলে কি মসজিদ থেকে অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে এমন কোন কথা আসেনি যে ঘরের ভেতর ইসলামী বয়ান দিতে গেলে মসজিদ থেকে অনুমতি নিতে হবে। সহীহ হাদীসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً "আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার কর।"

তবে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেটি প্রচার করবেন সেটি যেন সঠিক হয়। ভুল কোন কথা প্রচার করা যাবে না। অনেক ব্যক্তি হয়ত বলতে পারে, যারা দারুল উলুমে পড়াশোনা করেননি, যাদের ইসলামী শরীয়াহর ওপর কোন ডিগ্রি নেই, তারা দাওয়াতী বক্তব্য দিতে পারবেন না।

আবার আরেক দল তথাকথিত আধুনিক মুসলিম আছে, যারা বলে দারুল উলুম পশ্চাৎপদ প্রতিষ্ঠান অতএব এর প্রয়োজন নেই। আমরা এ দুটো এক্সট্রিম পর্যায়ের লোকদের দলে সামিল হাত চাই না। আমরা বলব, ইসলামের ওপর বক্তব্য দেয়ার জন্য দারুল উলুমে যাওয়া জরুরি নয়। যেকোন ব্যক্তিই যদি কোরআন ও হাদীস পড়ে এবং কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বক্তব্য দেয় তাহলে সে বক্তব্য দিতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে জানা, সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা জরুরি। আর সঠিক মানে জানার জন্য দারুল উলুমের ডিগ্রি থাকা অপরিহার্য নয়। এটা আমরা অস্বীকার করছি না যে, দারুল উলুম থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না। কিন্তু দারুল উলুম থেকেও কিছু ভুল শিখে তা প্রচার করলে সেটা ইসলামের জন্যই ক্ষতিকারক হবে। সুতরাং আপনি ঘরে ইসলামী বক্তব্য পেশ করতে চাইলে মসজিদ থেকে অনুমতি নেয়া জরুরি নয় এবং বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তা কোরআন ও হাদীসের আলোকে যথার্থ কিনা।

প্রশ্ন ঃ ৪৪। খ্রীস্টানরা বলে যে, পবিত্র আত্মা তাদের পথ দেখায়। তাদেরকে কিভাবে বুঝানো যায় যে, পবিত্র আত্মা বলে কিছু নেই।

উত্তর ঃ পবিত্র আত্মার অর্থ নিয়ে খ্রীস্টানদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল মনে করেন পবিত্র আত্মা হল হযরত জিবরাইল (আ)। এ দলটি সঠিক। তবে হযরত জিবরাইল (আ) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারও জন্য হেদায়েতের বাণী আনেন না। যেহেতু আমরা জানি পবিত্র হযরত মুহম্মদ (স া)-এর মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং জিবরাইল (আ) কর্তৃক আল্লাহর বাণী বহন করার কাজের সমাপ্তি ঘটেছে।

এখন আরেক দল আছে, যারা মনে করে পবিত্র আত্মা হল তিনটির একটি অংশ। কিন্তু এটি ভুল। খ্রীস্টান ধর্মে তথা তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ট্রিনিটি বলে কিছু নেই। কোরআনে সূরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে এসেছে "তোমরা ট্রিনিটি

বল না।" কেউ যদি পবিত্র আত্মা বলতে স্বয়ং ঈশ্বরকে বুঝান তাহলে সেটা ঠিক। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে যে কাউকে পথ দেখাতে পারেন। তবে পবিত্র আত্মাকে ট্রিনিটির অংশ ভাবা ভুল। বাইবেলে আত্মার কথা বলা হয়েছে। গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যে যীশু তার নিজের মুখে বলেছেন, আমি তোমাদের অনেক কথাই বলতে চাই; তবে তোমরা সেগুলো এখন বুঝবে না। কারণ তখন সত্যের আত্মা পৃথিবীতে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তোমাদের নিজের কথা বলবে না; বরং যা শুনবে সেগুলোই বলবে। সে আমাকে মহিমান্বিত করবে।

প্রকৃতপক্ষে এ সত্যের আত্মা হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়েত গ্রন্থ কোরআন নিয়ে এসেছেন।

সুতরাং খ্রীস্টানদের বুঝানোর ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে পবিত্র আত্মা বলতে তারা কি বুঝাচ্ছে। যদি তারা একে ট্রিনিটির অংশ বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে তাদের বুঝতে হবে যে, বাইবেল বা কোরআনে ট্রিনিটি বলে কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে আরও জানতে "সিমিলারিটিস বিটুইন ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইসলাম লেকচারটির ভিডিও সিডি দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪৫। অমুসলিমদের কিভাবে বুঝানো যায় যে, প্রস্রাব নোংরা জিনিস এবং এটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে?

উত্তর ঃ প্রস্রাব হল বর্জ্য পদার্থ এবং এটা নাপাক। ইসলামী শরীয়াহ প্রস্রাবকে নাপাক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও প্রস্রাব করে প্রস্রাবের রাস্তা পরিষ্কার না করলে নানা ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। যেকোন ডাক্তারই প্রস্রাব হওয়ার পর ভাল মত পানি নেয়ার কথা বলবে।

এভাবে একজন অমুসলিম প্রস্রাব নাপাক হওয়া সম্পর্কে বুঝানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪৬। বর্তমানে অনেক অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলিম পরিবার চায় না তাদের সন্তান এ ধরনের ধর্মান্তরিত মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করুক। এ প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর ঃ আমি আপনার সাথে একমত যে, পুরুষদের চাইতে মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে বেশি। ইসলাম গ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ। অমুসলিম মহিলাদের ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কারণ থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিয়ের আগে প্রেম। বিয়ে করতে হলে ধর্মান্তরিত হতে হয় বিধায় কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। তবে অধিকাংশ অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামকে জেনে, ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। এ ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, তারা অধিকাংশই অনেকক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ হবে। এমনকি মুসলিম পরিবারে যে সকল মুসলিম জন্ম থেকে বড় হয় তাদের চেয়েও বেশি এরা ধর্মপরায়ণ হয়।

সুতরাং ধর্মক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে যে অনীহা কাজ করে সেটা অনুত্তম; বরং এক্ষেত্রে যেহেতু ধর্মান্তরিত নওমুসলিমটির ইসলাম পালন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেহেতু অনুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ৪৭। মক্কা মদীনায় হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পূর্বে কি কোন ক্যালেন্ডার ছিল? কিভাবে সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে হিজরী ক্যালেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য করব?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে হিজরী ক্যালেন্ডার হল চন্দ্র ক্যালেন্ডারের। মক্কায় ও মদীনায় হিজরী সাল প্রবর্তনের পূর্বেও চন্দ্র মাসের হিসাব ছিল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় থেকে হিজরী সালের হিসাব শুরু হয়। এমনিভাবে সৌর ক্যালেন্ডারের আরেকটা নাম হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

সৌর ক্যালেন্ডারের ভিত্তি হল সূর্য। পৃথিবী নিজ কক্ষে একবার আবর্তন করে ২৪ ঘণ্টায়। সমগ্র সূর্যকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ১ বছর। সূর্যের চারপাশে এ আবর্তনের ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হয় এবং ঋতুচক্র ঘটে। এ কারণে পৃথিবীর যেকোন স্থানে যেকোন বছরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে একই ঋতু পাওয়া যায়।

চন্দ্র বছরের হিসেব হয় চাঁদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করার উপর। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে একবার আবর্তন করতে ১ চান্দ্র মাস পরিমাণ সময় নেয়। সৌর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য প্রায় ১১ দিনের। অর্থাৎ চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। ফলে চান্দ্র বছর সৌর বছরের মধ্যে আবর্তিত হয়। চান্দ্র বছরের কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দিষ্ট স্থানে একই ঋতু নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রতি ৩৩ সৌর বছরে চান্দ্র বছর হয় ৩৪টি। তবে চান্দ্র বছরের একটি হাকীকত আছে। পবিত্র রমজান মাস প্রতি ১ চান্দ্র বছরের একবার হওয়ায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত প্রত্যেক ঋতুতেই রোযা রাখার সুযোগ তৈরি হয়। রমজান মাস সৌর বছরে হলে দেখা যেত, পৃথিবীর কোন জায়গায় রোজা সব সময় গ্রীষ্মেই হত আবার কোন কোন জায়গায় সব সময় শীতেই হত। সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের মহীমা যে, তিনি রোজার হুকুমকে চান্দ্র বছরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৮। জিহাদ অর্থ কি? জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ জিহাদ শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ (জাহাদা) থেকে। জিহাদ যার অর্থ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। তবে অনেক অমুসলিম, এমনকি কতিপয় মুসলিমের ধারণা হল জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা। ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের বারোটি অর্থ আছে। এগুলো

হল নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করা, যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বা সংগ্রাম করা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

একজন ছাত্র যে স্কুলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করে সেটাও এক ধরনের জিহাদ। জিহাদ শুধুমাত্র মুসলিমরা নয় অমুসলিমরাও করে। তবে মুসলিমরা জিহাদ করে আল্লাহর পথে ও অমুসলিমরা জিহাদ করে তাগুতের পথে।

প্রশ্ন ঃ ৪৯। শিখ-ইজম ও সিন্ধি-ইজম এ দুটো ধর্মে ইসলামের ধারণাটা কি? শিখরা কি গুরু নানককে তাদের ঈশ্বর হিসেবে মানে?

উত্তর ঃ সিন্ধি হল যে ব্যক্তি সে সিন্ধু এলাকা থেকে এসেছে। এ ব্যক্তি যেকোন ধর্মালম্বী হতে পারে। একজন সিন্ধি মুসলিমও হতে পারে, হিন্দুও হতে পারে। সিন্ধুইজম বলে পৃথক কোন ধর্ম নেই।

শিখ-ইজম-এর শিখ শব্দটা এসেছে সিসিয়া শব্দ থেকে। সিসিয়া অর্থ শিষ্য। শিখিজম ধর্মে রয়েছে ১০ জন গুরু। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু হলেন নানক। তিনি পাঁচ নদীর উৎস জায়গা অর্থাৎ পাঞ্জাবে পনের শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পনের শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি এ ধর্মের উদ্ভব করেন। ১০ জন গুরুর সবশেষ জন হচ্ছেন গুরু গোবিন্দ শিং। শিখরা তাদের গুরুদের ঈশ্বর মনে করে না। তারা মনে করে গুরু হল পথপ্রদর্শক। শিখদের ধর্মগ্রন্থ হল গুরুগ্রন্থ সাহেব। একে আদিগ্রন্থও বলা হয়। শিখ-ইজম-এর মৌলিক নীতি হল পাঁচটি। প্রথমতঃ 'কেশ' শিখরা চুল কাটে না। দ্বিতীয়তঃ কড়া অর্থাৎ তারা হাতে চুড়ি বা ব্রেসলেট পরে। তৃতীয়তঃ কৃপাণ অর্থাৎ ছুড়ি। চতুর্থতঃ কাঙ্কা অর্থাৎ চিড়নী এবং শবশেষ কাচ্চা, যা এক ধরনের লম্বা অন্তর্বাস।

শিখরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। গুরুগ্রন্থ সাহেবের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ 'যাপজি'তে বলা আছে, "ঈশ্বর হলেন সত্য, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তার কোন শুরু নেই, তিনি কখনও জন্মাননি, তিনি সকল ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত, তিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।" সুতরাং কোরআনে ঈশ্বরের ধারণার সাথে শিখইজম-এর ঈশ্বরের ধারণার মিল রয়েছে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা মানে যে ঈশ্বর একজন। তারা তাকে এক ওংকারা বলে অভিহিত করে। গুরুগ্রন্থ সাহেবে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম দেয়া আছে। যেমন– কর্তার বা সৃষ্টিকর্তা, আকলি বা অবিনশ্বর, সাহেব বা প্রভু, পরওয়ারদিগার বা পালনকর্তা, কারিম বা পরোপকারী, রাহিম বা করুণাময়, ওয়াহে বা একমাত্র ঈশ্বর ইত্যাদি। শিখরা অবতারবাদে বিশ্বাস করে না এবং তারা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। সংক্ষেপে এই হল শিখ-ইজমের ঈশ্বরের ধারণা।

প্রশ্ন ঃ ৫০। যে জায়গায় ছয় মাস সূর্য দেখা যায় এবং ছয় মাস সূর্য দেখা যায় না, সে জায়গায় মানুষ কিভাবে নামাজ পড়ে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বলে দেয়া হয়েছে। সূর্য ওঠার আগে ফজর, সূর্য যখন মধ্য আকাশে থাকে তখন জোহর, সূর্য ডোবার আগে আসর, সূর্য ডোবার পরপর মাগরিবের নামাজ। এর পর দিন শেষে রাতের বেলা এশার নামাজ। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ভর করছে সূর্যের ওপর।

পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী ঘোরার কারণে দিন ও রাত হয়। তবে দু'মেরুর দিকে দীর্ঘ ছয় মাসব্যাপী দিন অথবা রাত থাকে। এ সকল স্থানে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য কোরআনে এ কথাটির সাহায্য নেয়া যেতে পারে যে, তোমার সব শহরের 'মা' এর দিকে তাকাও। অর্থাৎ মক্কার সময়কে ধিরে নামাজ পড়া যেতে পারে। অথবা সংশ্লিষ্ট স্থানের কাছাকাছি কোন শহর যেখানে দিন ও রাত সময়কাল স্বাভাবিক সে শহরের সময় অনুসরণ করা যেতে পারে। রোযা রাখার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ ৫১। যদি কোন মানুষ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদেরকে মুওয়াহিদ বলা যাবে? তাদেরকে কিতাবী বলা যায়?

উত্তর ঃ একজন ব্যক্তি শুধু মুখে নিজেকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বললেই তাকে মুওয়াহিদ বলা যাবে না। ইসলামী নাম থাকলেই মুসলিম হওয়া যায় না। মুসলিম হওয়া নির্ভর করে ইসলামের অনুসরণের ওপর। শিখধর্মেও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলা আছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রতিফলন তার আমলে পাওয়া যায় তখনই তাকে তৌহিদে বিশ্বাসী তথা মুওয়াহিদ বলা যেতে পারে। আহলে কিতাব বলতে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের বোঝানো হয়েছে। যদিও শাব্দিকভাবে ধরলে মুসলিমরাও আহলে কিতাব হয়। এমনকি অন্য যেকোন জাতি যাদের কাছে কিতাব এসেছে তাদেরকেও এ হিসাবে আহলে কিতাব বলা যায়। কিন্তু পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় আহলে কিতাব হল ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ। পবিত্র কোরআনের সূরা রাদের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেক যুগেই তোমাদের জন্য ওহী পাঠিয়েছি।" সুতরাং এখান থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক জাতির নিকটই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। কোরআন থেকে আমরা কেবল চারটি ওহীর নাম জানি, সেগুলো হল তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন। বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সেগুলো আসমানী কিতাব হয় ও সেটা নাযিল হয়েছিল নির্দিষ্ট যুগে নির্দিষ্ট জাতির জন্য। বর্তমানে সর্বশেষ আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এ কিতাব নাযিল হওয়ার

সাথে সাথে অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন সকল মানুষের শুধুমাত্র কোরআনেই বিশ্বাস করতে হবে এবং কোরআন মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫২। শিরক বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ 'শিরক' শব্দটি আরবি। শিরক অর্থ শরিক করা। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করাকেই ইসলামের পরিভাষায় শিরক বলে। শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। অন্যান্য ধর্মে এক ঈশ্বরের কথা বললেও ইসলামে এক ঈশ্বরের বিশ্বাসের সাথে তৌহিদে বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তৌহিদে শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ ওহাদা থেকে। ওহাদা অর্থ একতাবদ্ধ হওয়া বা একতাবদ্ধ করা। তৌহিদের তিনটি প্রকার আছে।

এক. তৌহিদ আল রুবুবিয়াহ

দুই. তৌহিদ আল আসমাউল সিফাত

তিন. তৌহিদ আল ইবাদাহ।

এক. তৌহিদ আল রুবুবিয়াহ অর্থ হল একত্রিত হয়ে একথা মেনে নেয়া যে, এ বিশ্ব জগতের কথাবার্তা ও পালনকর্তা কেবল একজন। তিনি হলেন আল্লাহ। পৃথিবীর সব মানুষ ও বিশ্বজগতের অন্য সব কিছু তার উপর নির্ভরশীল এবং তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন।

দুই. তৌহিদ আল আসমাউল সিফাত অর্থ আল্লাহর নামের ব্যাপারে একমত হওয়া। এটি আবার পাঁচভাগে বিভক্ত।

১. মহান স্রষ্টা আল্লাহকে আমাদের সেই নামে ডাকতে হবে যে নাম তিনি উল্লেখ করেছেন।
২. তার বর্ণনা কেবলমাত্র সেভাবেই দেয়া যাবে যেভাবে কোরআনে ও হাদীসে তার বর্ণনা এসেছে।
৩. আল্লাহ তায়ালার কোন গুণ অন্য কারোও ওপর আরোপ করা যাবে না। যেমন– বলা যাবে না যে ঐ মানুষটি অবিনশ্বর, তার শুরু নেই ইত্যাদি।
৪. আল্লাহর নাম অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। যেমন– 'আব্দুর রহমান' বলা যাবে কিন্তু কাউকে 'রহমান' বলা যাবে না।
৫. আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ওপর আরোপ করা যাবে না। যেমন– মানুষ ভুল করে কিন্তু এটা বলার সুযোগ নেই যে আল্লাহ ভুল করে, আল্লাহ ভুল করেন না।

তৌহিদ আল ইবাদাহ অর্থ হল শুধু আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে অন্য কাউকে তার ইবাদাতে শরীক করা যাবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয় সাথে অন্যান্য কথিত রব বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে হবে।

তৌহিদের এ তিনটি প্রকারের যেকোন একটির শর্ত হল শিরক।

প্রশ্ন ঃ ৫৩। পিতামাতার আনুগত্যের সীমা কি? আমার একজন মুসলিম বন্ধু একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছে, কিন্তু তার পিতামাতা লোক লজ্জার ভয়ে এ বিয়েতে রাজি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে পিতামাতার অবাধ্য হতে হয়। আমরা তো জানি, ইবরাহীম (আ) একবার তার সন্তান ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেছিলেন আবার কোরআনে সূরা ইসরার ২৩ নং আয়াতে এসেছে, তোমরা পিতামাতার প্রতি 'উফ্' শব্দটি পর্যন্ত কর না। তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত মুসলিম লোকটির কি করণীয়?

উত্তর ঃ পিতামাতার হুকুম যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে না হয় তাহলে মানা যাবে। এটা হল পিতামাতার অনুগত থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সীমা। সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে এসেছে, "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের। মা অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছর বয়সে।" অর্থাৎ পিতামাতার কথা মানতে হবে, এর পরবর্তী আয়াতে এসেছে, 'যদি তোমার পিতামাতা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার ব্যাপারে জোর করে তাদের কথা মানবে না; তবে তাদের সাথে সৎভাবে বাস করতে হবে।'

একই ধারার কথা আছে সূরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াতে। সুতরাং পিতামাতা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিলে তা মানা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, যদি পিতামাতা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে না গিয়ে কোন নির্দেশ দেন সে নির্দেশ মানতে হবে কিনা?

এর উত্তর হল, নির্দেশ মানাটাই উত্তম। এখন উক্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, উক্ত অমুসলিম মহিলা কি কারণে মুসলিম হয়েছে। যদি অমুসলিম মহিলাটি পূর্ব থেকেই ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তারা বিয়ে করার জন্য মুসলিম হয়ে থাকে তাহলে পিতামাতার নির্দেশ মেনে নেয়াই উত্তম। কেননা একজন মুসলিম পিতার বা মাতার লোকলজ্জার ভয়ে নয়; বরং ধার্মিকতার বিচারে মেয়েটিকে যাচাই করেই তার সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা। তবে যদি মেয়েটি ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মুসলিম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পিতামাতাকে ভালমত বুঝাতে হবে যে, এখানে লোকলজ্জা কোন বড় ইস্যু নয়; বরং মেয়েটির পূর্ণাঙ্গ মুসলিমে পরিণত হওয়াটাই বড় ব্যাপার।

আর ইবরাহীম (আ)-এর উদাহরণ এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ ইবরাহীম (আ) নবী এবং নবীর আদেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও পরিস্থিতিটাও গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার প্রতি 'উফ' শব্দ না করার মানে হচ্ছে বিরক্ত না হওয়া বকাবকি না করা। তবে পিতামাতা যদি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য

বলে সেক্ষেত্রে যেমন তাদের নির্দেশনাকে মানা যাবে না এবং হাসিমুখে বুঝাতে হবে, ঠিক তেমনি উপরে আলোচিত উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ হয়ে থাকলে, অনুরূপভাবে পিতামাতাকে রাজি করানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৫৪। যীশু বলেছেন, "আমার পিতা আমার চাইতে মহান" বা আমার পিতা সবার চাইতে মহান।" আমার প্রশ্ন হল, স্রষ্টাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ আছে কি?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম দেয়া আছে। তবে কোরআনে কোথাও তার 'আব' বা 'পিতা' নাম নেই। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের কোন রূপক নাম কোরআনে ব্যবহার করেননি। যেন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরকে পিতা তথা জৈবিক পিতা ভেবে না বসে। পিতা নামটা আল্লাহর কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

বাইবেলে আল্লাহ পাকের একটি নাম ছিল 'পিতা'। যীশুখ্রীষ্ট স্রষ্টাকে পিতা বলে ডাকতেন। তবে, বাইবেল সঠিক হোক বা ভুল হোক বাইবেল একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাযিল হয়েছিল। কোরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে আমরা যে যেই দেশেরই অধিবাসী হইনা কেন, আমাদের জন্য কোরআনের আদেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর কোরআনে যেহেতু আল্লাহ তায়ালার পিতা নামক কোন বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়নি, অতএব ঈশ্বরকে পিতা ডাকা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৫৫। ভারতীয় অনেক মুসলিম দ্বিধায় আছেন। কিংফিশার এয়ারলাইনসে চাকরি করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার ব্যাপারে নিয়ম হল এ যদি উক্ত কোম্পানিতে অধিকাংশ কাজ হয় হারাম, তাহলে সেখানে চাকরি করা হারাম। যেমন– ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাংক সুদী লেনদেন করে, সে ব্যাংকের যেকোন ধরনের চাকরিই হারাম।

যে সকল কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কিছু কাজ হারাম, সে সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করা যেতে পারে এ শর্তে যে, হারাম কাজটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। ফাইভ স্টার হোটেল। এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অল্প অংশ হারাম। যেমন– 'বার'-এর অংশ। এ অংশে মদ পরিবেশন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে বারের সাথে সম্পৃক্ত কাজ ব্যতিরেকে অন্য যেকোন কাজ করা যেতে পারে।

এয়ারলাইনসের চাকরি করার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। যে সকল এয়ারলাইনসে মদ পরিবেশন করা হয় সেখানে এয়ার হোস্টেজ হিসেবে চাকরি করা যাবে না। তবে টিকিটিং, একাউন্ট গ্রাউন্ড স্টাফ এ জাতীয় কাজগুলো করা যাবে।

কিংফিশার মূলত একটি মদ উৎপাদনকারী কোম্পানি। এ কোম্পানির একটি সহব্যবসায় হল এয়ারলাইনস। যদি এ এয়ারলাইনসের উদ্দেশ্য হয় মদ ব্যবসায়

প্রমোট করা, তাহলে এয়ারলাইনসে চাকরি করা যাবে না। তবে যদি এ এয়ারলাইনসে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবসা হয়, সেক্ষেত্রে কিংফিশার নামে কোন সমস্যা নেই। চাকরি করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৬। ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণের ঘড়ি পরা হারাম করা হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ সহীহ হাদীসে পুরুষদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার পরা হারাম করা হয়েছে। একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে ইসলামী শরীয়াহ এটা হারাম করেছে। তবে যুক্তি দিয়ে বলা যায়, এর কারণ হল স্বর্ণালঙ্কার পরা অমিতব্যয়ের লক্ষণ বা বড়াই করে দেখানো। কোরআনের সূরা ইসরার ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই'। সুতরাং এ ধরনের অপব্যয় থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ ৫৭। আমরা কি রোগ নিরাময়ের জন্য রেইকি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে পারি?

উত্তর ঃ রেইকি পদ্ধতি হল জাপানে প্রচলিত এক ধরনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসাপদ্ধতি। যেকোন কাজের ব্যাপারে শরীয়াহর নিয়ম হল যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে না যায় তাহলে সেটা করা যাবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যদি সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি শরীয়াহর কোন সীমালঙ্ঘন না করে তাহলে তা পালন করা যাবে। যেমন– অ্যালকোহলযুক্ত ঔষধ খাওয়া হারাম, তবে যদি বিকল্প না থাকে সেটা ভিন্ন কথা। হাদীসে অন্যান্য ধর্মের প্রতীক যেমন পৈতা পরা, ক্রুস পরিধান করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যেকোন ধর্মের পদ্ধতি যদি সেটা ইসলামী শরীয়াহর বাইরে না যায় তাহলে নিয়তকে ঠিক রেখে সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি কোন ধর্মের বিশেষ দিনে বিশেষ রীতিতে আলু খাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আলু খাওয়া যাবে। কেননা আলু খাওয়া ইসলামে হারাম নয়। কিন্তু কোন ধর্ম যদি বলে মূর্তির সামনে সেজদা করলে ঐ রোগটি ভাল হবে। এ পদ্ধতি পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৫৮। টাকার উপর বিভিন্ন ছবি, যেমন মূর্তির ছবি, মানুষের ছবি ইত্যাদি থাকে। প্রশ্ন হল পকেটে টাকা রেখে নামাজ পড়া কি হারাম?

উত্তর ঃ পকেটে টাকা রেখে নামাজ পড়তে কোন সমস্যা নেই। টাকা না দেখা গেলেই হল। মাথার সামনে, নামাজের স্থানে টাকাটা এমন অবস্থায় রাখা হল যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে নামাজ পড়া যাবে না। কেউ বলতে পারে নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু নিয়ত নয় সাথে কাজ ঠিকমত হওয়া জরুরি। কেউ যদি মূর্তির সামনে সিজদাহ দিয়ে বলে 'আমার নিয়ত হল আল্লাহকে সিজদা করা' সেটা ভুল। সুতরাং টাকা এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে টাকাটা দেখা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে নামাজ হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৯। বাড়ী তৈরি করার সময় কি আর্কিটেক্ট ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর ঃ আর্কিটেকচারে শরীয়াহ বিরোধী কিছু না থাকলে সেটা ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ঃ ৬০। কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে কি তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির : আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, একজন ব্যক্তি যে ইন্ডিয়া সরকারের গোপনীয় বিষয়, যেমন– সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী বা অন্য পক্ষের নিকট প্রকাশ করে দেয় আর তা যদি প্রমাণিত হয়, সে ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহলে কি ইন্ডিয়া সরকার তাকে শাস্তি দিবে না? নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণসহ তাকে ধরতে পারলে এমন অপরাধের জন্য অবশ্যই সে শাস্তি পাবে। সে রাষ্ট্রের সাথে প্রতারণা করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন প্রতারণা করে বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং কারও সম্পর্কে বানোয়াট কিছু বলে এবং তা প্রমাণ করা যায় তাহলে আমি মনে করি তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬১। ডা. জাকির নায়েক, কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির: হ্যাঁ, প্রশ্ন হলো আমরা এ ধরনের শাস্তি দিতে পারবো কি না? ধরুন প্রত্যেক Crime এর জন্য শাস্তির বিধান আছে এবং এ শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলবো, ধরুন আপনি কোন কারণ ছাড়াই ট্রেনের চেন টানলেন, তার জন্য পাঁচশত রূপি জরিমানা হবে অথবা তিন মাসের জেল হবে। আপনি এই অপরাধ করে ধরা পড়লেন তারপর একটিবারে আপনাকে কেবল পাঁচশত রূপি জরিমানা করলো, অথবা অন্য বিচারক আপনাকে পাঁচশত টাকা জরিমানার সাথে ১ মাসের জেল আবার অন্য বিচারক আপনাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। অপরাধের শাস্তির রায় বিচারক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এক এক বিচারপতি এক এক রকম শাস্তি দিতে পারেন।

এখন আসুন Religions Fundamentalism ধর্মীয় মৌলবাদ Blasphame (আল্লাহ বা রাসূলের বিরুদ্ধে বিষোদাগার) এর বিষয়ে কি বলেছে তা আলোচনা করি– (Blaspheme) ব্লাস ফেমির বিরুদ্ধে কুরআন কি বলে? আমি কুরআন থেকে উল্লেখ করছি– কুরআন এর সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

এটি হলো কুরআনের আইন, এ বিষয়ের জন্য কুরআনের আইন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ: "আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল, আয়াত নং ১২৫)

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি তাসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে কি করবো, তাহলে আমি বলবো- যেহেতু কুরআন আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাই তাকে আমি এ ধরনের পাবলিক ডিবেটের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো।

প্রশ্ন ঃ ৬৩। আমাদের প্রশ্ন হলো, সে এমন অপরাধ করলে তার শাস্তি কি হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : শাস্তির মাত্রা অবশ্যই বিচারকের উপর নির্ভর করবে। আপনাদের জানা আছে, যে তথ্য প্রমাণসহ অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারের শাস্তি এক এক সময় এক এক জন বিচারকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনি যদি ধর্মীয় মৌলনীতি বিষয়টি অধ্যয়ন করেন তাহলে- 'বাইবেল' এ বিষয়ে কি বলেছে?

বাইবেল বলে, আমি যদি ভুল বলি তাহলে এখানে উপস্থিত 'ফাদার' সঠিকভাবে বলতে পারবেন, ওল্ড টেস্টামেন্টের ৩য় খণ্ডের চ্যাপ্টার নং ২৪; আয়াত নং ১৬ এ বলা হয়েছে।

"যদি কোন ব্যক্তি প্রভুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।"

একজন ফান্ডামেন্টালিস্ট খ্রিস্টান অবশ্যই খৃষ্টধর্মের পূর্ণ অনুসারী হয়। তাহলে Book of Leviticus -ch,. 24. N. 16 তে পড়ে থাকবেন যেখানে খোদা সম্পর্কে কটূক্তির বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে।

Anyone who blasfimate the name the lord he shall certainly before to death. And all congregation shall surely told name. And even the stranger blaspheme before to death."

সুতরাং আপনি যদি একজন একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান হন এবং খোদার বিরুদ্ধে ব্লাকফিমেট করেন তাহলে বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে হত্যা করা হবে।

বাইবেলে অন্য বিধান দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেসব বিধানের একটি হলো এই বিধান।

প্রশ্ন ঃ ৬৩। যদিও ডা. জাকির নায়েকের অনেক বিতর্কে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারপরও আমি তার নিকট থেকে "হ্যাঁ অথবা না" এমন উত্তর জানতে চাই। তসলিমা নাসরিন এর বিরুদ্ধে যে বিষয়ে ফতোয়া হয়েছে, আপনি কি তার বিরুদ্ধে এমন অমানবিক ফতোয়া সমর্থন করেন, না করেন না? এক কথায় উত্তর দিবেন।

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক : আমার এই ভাইটি প্রশ্ন করেছেন, তাসলিমা নাসরিনকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যা কয়েক ব্যক্তি ঘোষণা করেছে বা দুইজন বা তিনজন বা চারজন হোক, তারা যে তাসলিমার মাথা নেওয়ার শাস্তি দিয়েছে আমি তা সমর্থন করি কি না? তা এক কথায় বলতে হবে। বিশ্বাস করুন ভাই, আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী। ইসলামী মূলনীতি আমাকে এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় না। এটা অবশ্যই অনুমোদিত নয়। আমি অবশ্যই এর উত্তর দিব, তার আগে আমি অবশ্যই এ বিষয়ে কি বিধি-বিধান আছে তা উল্লেখ করবো? তারপর এ আলোকে তাকে মূল্যায়ন করবো।

প্রশ্ন ঃ ৬৪। আমি ফুলটাইম সাংবাদিক নই, ডা: নায়েক, আমি জানতে চাই যেসব লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে, তাদের কি এমন করার কোন সুযোগ আছে? আপনি কি মনে করেন?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক: আমার এই ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, যে সকল লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি অনুমোদন করেছে তারা কি তাসলিমাকে তার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার কোন সুযোগ দেবে কি না? আমি জানি না, বিশ্বাস করেন, আমি জানি না। দিতে পারে আর নাও দিতে পারে, আমি জানি না। আমি তো এসব খবর কাগজের মাধ্যমে জানলাম কে সত্য বলছে তা আমি

ব্যক্তিগতভাবে জানি না। যে সব পত্রিকাতে তার সম্পর্কে পড়লাম তার একটিতে লিখেছে তার বয়স ২৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে তার বয়স ৩১ বছর। অন্য একটি পত্রিকা লিখেছে ৩৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে সে কেবল MBBS ডাক্তার। অন্য পত্রিকা লিখেছে সে গাইনোলজিস্ট, আবার অন্য পত্রিকা লিখেছে অন্যটা, যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন সে আসলে কি? তাহলো আমি বলবো, আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ ৬৫। আমি ডা: ভিয়াসকে একটি প্রশ্ন করতে চাই?

আপনি বলেছেন যে, ডা: জাকির নায়েক কি তাকে এখানে ডাকতে পারবে? তসলিমা নাসরিনকে প্রত্যেক বিষয় জিজ্ঞেস করতে পারবে? তার পেশা সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞেস করবে কি? এমনকি ডা: জাকির নায়েক তাকে (তাসলিমাকে) মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতে পারবে কি? অথবা তার শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে পারবে কি না, ইত্যাদি?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক : এমন করতে পারবে না। আমার সে কর্তৃত্ব নেই। আমি কেবল 'ফতোয়া' দিতে পারি। অনুগ্রহ করে উত্তেজিত হবেন না। আমাকে ফতোয়ার অর্থ বলতে দিন। আমি আবারও আরবি শব্দ ফতোয়ার অর্থ আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই। আরবি শব্দ 'ফতোয়া' এর অর্থ হলো মতামত, মন্তব্য। কিন্তু আমার মতামতের আপনি গ্রহণ নাও করতে পারেন।

যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকের তার নিজের মত প্রকাশের অধিকার আছে, আমারও আছে, ভাই আপনারও আছে। (তসলিমাকে) তার মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমরা এ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারি এ বিষয়ে আপত্তি করতে পারি। কিন্তু আমি তাকে শাস্তি দিতে পারি না। একমাত্র কাজী (বিচারক)-র অধিকার আছে তার বিচার করার। উদাহরণ স্বরূপ একজন আইনজীবী যেমন বিচারকের নিকট তার Verdict জানাতে পারে তার মতামত জানাতে পারে কিন্তু বিচারক আইনজীবীর থেকে ভিন্ন রায় দিতে পারে। 'ফতোয়া' অবশ্যই Judgement হওয়ার দরকার বা প্রয়োজন নেই। আশা করি ভাই, আপনি এটা মনে রাখবেন। আমি যদিও একজন বিশেষজ্ঞ নই, আমি কেবল একজন ডাক্তার, তাই আমি ইসলামী বিষয়ে কোন 'ফতোয়া' দিতে পারি না। 'ফতোয়া' তা যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত হয়, তাহলে আমি তা দিতে পারি কিন্তু বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্যই তা আমি পারি না এবং আমি কোন রায়ও দিতে পারি না। কেননা আমি কোন জজ নই। আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নানুযায়ী, আপনি জানতে চেয়েছেন, একই অপরাধের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হতে পারে? অথবা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হতে পারে কি? সঠিক নয় কি? আপনি কি আপনার প্রশ্নটি আবার উল্লেখ করবেন?

প্রশ্ন ঃ ৬৬। বিভিন্ন দেশে আইনের বিভিন্ন ধারা আছে উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়ার কথা বলি। ইন্ডিয়াতে আইনের শাসনে আইন প্রণয়নের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। যেমন– পারিবারিক আইন, সম্পত্তি আইন, ইত্যাদি এইসব আইনের আওতায় শাস্তিও ভিন্ন রকম। আমি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে বলি।

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক: ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ভিন্ন কোন শাস্তির বিধান করা যায় কিনা?

প্রথমে ইন্ডিয়ার কথা বলবো, তারপর বাংলাদেশের কথায় আসবো। আমি দুঃখিত, আমি ইসলামী আইন ভেবেছিলাম। আমাদের ইন্ডিয়াতে মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে যে ল'বোর্ড গঠন করা হয় তারা কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারা শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে রায় প্রদান করে থাকেন। যেমন– তালাক, বিবাহ, ওয়ারিশ সংক্রান্ত (In heritence) ইত্যাদি। তারা ফৌজদারী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। কারণ, আমাদের ইন্ডিয়াতে কমন ফৌজদারী আইন রয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্ন ভিত্তিহীন। এবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলি। আমি এ বিষয়ে ভাল জানি না, আপনারা এমনটা ভাববেন না যে, আমি আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি জানি যে বাংলাদেশে কত ধরনের বিচারালয়, কোর্ট রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলেন, তাহলে বলবো তখন খিলাফত ছিল। তখন যিনি খলিফা ছিলেন তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান, খেলাফত ব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তখন নিম্ন আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারতো, আবার তা সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারত। যিনি খলিফা হিসেবে নিয়োগ পেতেন তিনিই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। কোন নিম্ন আদালত ডিফল্টার (বিচারে ব্যর্থ) হলে যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন। খলিফা ছিলেন সুপ্রিম জজ। কিন্তু বর্তমানে সে খিলাফাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের বিচার পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি, তা আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬৭। একটি বিষয় আপনার থেকে জানতে চাই, যে বিষয়ে আপনার কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাহলো, বাংলাদেশের যেসব মাওলানা যারা সামাজিকভাবে অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান, সম্মানিত, তারা তো সে দেশের কোন নিম্ন আদালত বা উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ পায়নি। কিন্তু তারা তো জন সম্মুখে 'তাসলিমার' জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে। আমার প্রশ্ন হলো– তাদের এ 'তাসলিমা নাসরিনের' মাথার জন্য এমন ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আছে কি?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক: আপনি যদি আগের প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন তাহলে সেখানেই আমি এর জবাব দিয়েছি। আমি সেখানে বলেছি, আমি আপনিসহ প্রত্যেকের 'ফতোয়া' দেওয়ার অধিকার আছে। ফতোয়া অর্থ হলো 'মতামত' সে (মাওলানা) 'ফতোয়া' দিতে পারে। সে তাসলিমা নাসরিনের মাথা কেটে নেওয়া হবে এমন মতামত দিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৬৮। তাই বলে কি সে (মাওলানা) পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ৫০ হাজার টাকার বিষয়টি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রশ্ন করার সময় এ টাকার কথা বলেন নি। এ বিষয়টি এইমাত্র বলছেন, তবুও আমি এর উত্তর দিব।

কারও কি অধিকার আছে যে অন্য কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করা? কারও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেওয়ার পর কেউ কি অন্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবে? অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া, মানহানিকর কোন বক্তব্য দেওয়ার অধিকার আছে কি? যে কারও ফতোয়া বা মত প্রকাশের অধিকার থাকলেও আপনি নিশ্চয় অন্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু বলতে পারেন না, অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে পারেন না। এটা যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে থাকে, তাহলে তাসলিমা নাসরিনের এ অধিকার আছে যে সে ঐ মাওলানাকে বিচারের সম্মুখীন করবে। তাসলিমা নাসরিন মাওলানাকে ইসলামী কোর্টের আওতায় নিতে পারে।

তাসলিমা তার বিরুদ্ধে ইসলামী কোর্টে বিচার চাইতে পারে। কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি তাসলিমা নাসরিনকে অপবাদ বা মানহানি করে তাহলে সেখানে তাসলিমা নাসরিনের এই অধিকার আছে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী কোর্টের বিচারের মুখোমুখি করবে। সে ইসলামী আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে, বিচার চাইতে পারবে। কিন্তু আমি জানি না, বাংলাদেশ কতটুকু ইসলামী রাষ্ট্র? সেখানে কি পরিমাণ ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয়? তারা হয়তো ইসলামী আইন অনুসরণ করে হয়তো বা করে না। আমি জানি না। ভাই আপনারা আমাকে আমার উত্তর শেষ করতে দিন। আমি কোন দেশের আইনের কথা বলছি না। আমি কেবল ইসলামের সাধারণ যে বিধান রয়েছে তাই বলছি। সুতরাং তাসলিমা নাসরিন যদি মনে করে মাওলানা তার বিরুদ্ধে মাথা কেটে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তার মাথার যে মূল্য ঘোষণা করেছে তা অন্যায়, তাহলে তার অধিকার আছে সে (তাসলিমা) ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী আদালতের বিচারের সম্মুখীন করার।

যদি কেউ এমন থাকে এবং তাকে অবশ্যই আদালতের সম্মুখীন করতে পারবে। কিন্তু আমাকে আমার উত্তরের সাথে ফাদার পেরেরার মন্তব্যের সাথে

সংযুক্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি' আইন প্রণয়ন করা খুবই সহজ এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই সহজ। তিনি এর স্বপক্ষে তাসলিমা নাসরিনের উদাহরণ দিয়েছেন। আসলে এ বিষয় এত সহজ নয় যতটা সহজ বলেছেন ফাদার পেরেরা। কারণ, আপনি যদি কোন অভিযোগের জন্য ইসলামী আদালতে সাক্ষী উপস্থাপন করতে চান তাহলে ছোট অপরাধের জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে আর বড় বা গুরুতর অপরাধের জন্য কমপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে।

আর যদি চারজন সাক্ষীর কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয়, আদালতে সাক্ষীগণের জেরা করার সময় কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয় তাহলে চারজনের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারা হবে। প্রত্যেককে ৮০টি চাবুক গ্রহণ করতে হবে। এটা খুবই সহজ নয়। এটা ইন্ডিয়ার আদালতের শপথ করা। "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব" এমন শপথ করার মত সহজ নয়। ইন্ডিয়া সরকারের আদালতে গিয়ে "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না" বলে শপথ করার মত সহজ নয়। আপনি যদি ভুয়া প্রমাণিত হন তাহলে আপনাকে ৮০টি চাবুক সহ্য করা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। ফাদার পেরেরা যতটা সহজভাবে উল্লেখ করেছেন তেমন সহজ নয়। আশা করি, ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬৯। ডা. জাকির নায়েক, আমি সাজিদ রশিদ, উর্দু টাইমস্ থেকে এসেছি। আমরা এমন দেশে বসবাস করছি যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করছি এবং এই দেশের যে সংবিধান রয়েছে সেখানে জনগণের শাস্তির বিধানের জন্য সাধারণ আইনও আছে। যা সব জনগণের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন এমন একটি দেশে বসবাস করে কোন ব্যক্তি যদি কুরআনকে অস্বীকার করে বা কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এমন অপরাধের জন্য ইসলামী আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য আপনি কি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন? যেখানে এমন একটি দেশের যার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে কুরআন অবমাননার জন্য ইসলামী আইনের বিধান মতে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া আপনার জন্য কি যথার্থ হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন। যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একসাথে বসবাস করছি তারপরও কি আমরা প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব আইন মেনে চলছি? ধরুন, আপনাদের কেউ কুরআনের অবমাননা করলো, আপনি কি ইসলামের আইন মেনে চলতে পারবেন? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারবেন? আমাকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে দিন সে যে কোন দেশেই হোক তা সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়া সব দেশের ফৌজদারী (Criminal law) আইন সকলের জন্য সমান।

সেখানকার (Criminal law) কেবল পরিবর্তন হতে পারে। সৌদি আরবের (Criminal law) সকলের জন্য একই রকম হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। এই ইন্ডিয়াতেও ফৌজদারী আইন (Criminal law) মুসলিম বা অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে একই রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না। এক এক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকম ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না। আপনি সেখানে আপনার মতামত জানাতে পারেন, আপনি বলতে পারেন তার জন্য এক/দুই বা তিন বছর ইত্যাদি রকম শাস্তির জন্য মতামত দিতে পারেন। আপনি এমন মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু কোনভাবেই তা প্রাকটিস করতে পারবেন না। কারণ, আপনাকে অবশ্যই সাধারণ যে ফৌজদারী আইন (Criminal law) রয়েছে তাই প্রাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে। কোনভাবেই আপনি কুরআনের আইনের বাইরে যেতে পারবেন না। কুরআনের বিধানের থেকে দূরে যেতে পারবেন না। যেহেতু ইন্ডিয়া ইসলামিক রাষ্ট্র নয় তাই আপনি এখানে কুরআনের আইনের বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। আপনি এখানে কেবল এখানকার সাধারণ ফৌজদারী আইন (Common Criminal law) মেনে চলতে হবে। আশা করি, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭০। আমি মারিয়া, আমি খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক সিস্টার। আমার প্রশ্ন মি. অশোক সাইনির কাছে। আপনি কেন তসলিমার বই 'লজ্জা' মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করলেন?

উত্তর ঃ অশোক সাইনি ঃ যে কারণে আমি এই বই অনুবাদ করেছি তার প্রথম কারণ হলো, আমি এই বই পছন্দ করি। অন্য কারণ হলো যে ধরনের বই হোক তা একটি বিশাল অর্জন। কারণ, তাসলিমার সেই সাহস আছে যেখানে একটি মুসলিম প্রধান দেশে সংখ্যালঘুদের ধারাবাহিক নির্যাতন দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছেন। তার এগুলো লেখার সাহস আছে এবং সে লিখেছে। একই ঘটনা আমাদের দেশে গত ডিসেম্বর– জানুয়ারি মাসে ঘটেছে বোম্বের দাংগায় অনেক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হয়েছে। অথচ কোন মহৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাহসিকতার কাজটি করেন নি। কেউ বলেনি যে এ ঘটনা আমাদেরকে বড় একটা লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাসলিমা এই সাহস দেখিয়েছে এবং সে লিখেছে। কাজ করে দেখিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৭১। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিজেরাই তসলিমা নাসরিনের মাথার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করে তাকে লাইম লাইটে (আলোচিত) আনার জন্য দায়ী। যদি তারা (মৌলবাদীরা) তার এ বিষয়টি আলোচনায় না আনতো এবং সে যা

লিখেছে তা অবহেলায় রাখতো তাহলে আমরা কি আজকের এ সমাবেশে একত্রিত হতাম?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন। যদি তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদী আমি তাদেরকে তথাকথিত মৌলবাদী মুসলিম বলবো। তারা যদি তাসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষণা না করতো তাহলে আমরা আজকের এই সমাবেশে জমায়েত হতাম না। ভাই, আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু আপনি যেমন মুসলিম মৌলবাদীদেরকে দোষারোপ করছেন তেমনি আমি দোষারোপ করি মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমকে। এখানে আমাদের মতভেদ যদি এই রকম একটি অখ্যাত, প্রভাবহীন অগুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন যেমন BSSP বাংলাদেশ সাহাবা সৈনিক পরিষদ যাকে বলতে গেলে কেউই চিনতো না। বলেন, কে এই সংগঠনকে চেনেন? কে এই সংগঠন কে জানতেন? নিশ্চয়ই কেউ জানতেন না, চিনতেন না, যাইহোক, যদি এই সংগঠনের প্রধান মাওলানা হাবিবুর রহমান যাকে আমি চিনি না, যদিও কেউ কেউ তার শাস্তি ঘোষণা করেছে, যদি এমন একজন অখ্যাত ব্যক্তি এবং গুরুত্বহীন, প্রভাবহীন একটি সংগঠন এমন শাস্তি ঘোষণা করেই থাকে তাহলে ইন্ডিয়ার মিডিয়াগুলো কেন এমন হৈ চৈ করছে? সংবাদ মাধ্যমগুলো কেন তা ফলাও করে প্রচার করছে? তার এ বিষয়টি ফ্রন্ট পেজে স্থান পাচ্ছে। ইন্ডিয়ার পত্রিকাগুলো এই খবরটি তাদের প্রথম পাতায় নিউজ করছে। ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশের হাই কমিশনারের ভাষ্য মতে, এটি আমি দিল্লির পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি, বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, ইন্ডিয়ার নিউজ পেপারগুলো তাসলিমা নাসরিনকে নিয়ে যত খবর প্রকাশ করছে তা এমন যে,

বাংলাদেশের নিউজ পেপারগুলোতে যত নিউজ হয় তা ইন্ডিয়ার পেপারগুলোতে প্রকাশিত নিউজের এক পারসেন্টও হবে না। আপনি অভিযোগ করেছেন, দোষারোপ করেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলিম মৌলবাদীরাই দায়ী এবং তারা অভিযুক্ত হতে পারে। হয়তো হয়ে থাকবে, আপনি তাদেরকে অভিযুক্ত করেন বা না করেন সেটা আপনার বিষয় কিন্তু আমি বলবো এর জন্য ইন্ডিয়ার মিডিয়া, ইন্ডিয়ার সংবাদপত্রগুলো অনেক বেশি দায়ী। যদি তারা (মিডিয়া) তাকে ফলাও করে প্রচার না করতো তাহলে এখানে আলোচনাও করতে হতো না।

প্রশ্ন ঃ ৭২। আমার কথা হলো ইন্ডিয়ার মিডিয়া এই বিষয়টি এই জন্য হাইলাইট করছে যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তার (তসলিমা) জীবন রক্ষার চেষ্টা করছে। কেননা সে এখন নিঃসঙ্গ অসহায় ধর্মান্ধ কতগুলো উগ্র লোকদের সামনে অসহায় এই নারীকে বাঁচানোর জন্যই ইন্ডিয়ার মিডিয়ার এই চেষ্টা।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমার এই ভাই বলেছেন, ইন্ডিয়ান মিডিয়া অখ্যাত এক সংগঠন ও অপরিচিত গুরুত্বহীন মাওলানা হাবিবুর রহমান থেকে

তাসলিমাকে রক্ষা করার জন্য এই ইস্যুটি হাইলাইট করছে। আজ যদি সে বলে আমি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবো তাহলে কি এটা আগামীকালের পেপারে হেড লাইন হবে? এখন আপনাদের অনেকে আমার কথার মাঝে মন্তব্য করছেন, যারা করবেন তারা আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। এটা কেবল আমার মতামত। এখানে উপস্থিত শ্রোতাদের কারও নিকট আমার মতামত ভাল লাগলে সে তা গ্রহণ করবে আর কারও ভাল না লাগলে সে তা গ্রহণ করবে না। আমার মত প্রকাশের তো স্বাধীনতা আছে। আমি মনে করি যদি কোন অখ্যাত সংগঠন এখন ঘোষণা করে তাহলে তা নিয়ে হৈচৈ করার কিছু নেই। হ্যাঁ, যদি কোন নেতৃস্থানীয় বা Leading organinzation এমন ঘোষণা দিতো তাহলে সে ভিন্ন কথাটা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বা তারা সঠিক করলো বা ভুল করলো সে বিষয়ে মন্তব্য করছি না, আমি কেবল বলবো কেন এমন অখ্যাত সংগঠন বিষয় হেড লাইন হবে?

বৃহত্তর স্বার্থে আমার কোন মন্তব্য নেই। আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনি গ্রহণ করতে পারেন আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে এটা বর্জন করতে পারেন আমার কোন মন্তব্য নেই।

ড. আশোক সাইনি ঃ আমার একটি সংশোধনী আছে। তাসলিমা নাসরিঁনের মস্তকের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে তার যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা একটি গুরুত্বহীন ও অখ্যাত সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ডা. জাকির নায়েক যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে ঠিক নয়। এই ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ঘোষণা।

প্রশ্ন ঃ ৭৩। আমি প্রফেসর হামজা ইবনে রামীম। আমি অশোক সাহানীকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি বলেছেন যে সাংবাদিকরাই তসলিমা নাসরিনের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। আবার ঐ ভাই বলেছেন যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তাসলিমা নাসরিনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমি জানি না আপনি সাংবাদিক কিনা, সাংবাদিকদের কথা বলেছেন, কিছু সাংবাদিক তাসলিমা নাসরিনের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছেন এবং ঐ ভাই বলছেন যে সাংবাদিকরাই তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আমি জানতে চাই কোনটি সঠিক, তারা কি তাসলিমাকে বিপদে ফেললো না তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

উত্তর ঃ অশোক সাইনি ঃ সমস্যাটি অবশ্যই খুব সামান্য নয়। এটা একটা জটিল সমস্যা। সেই অনেক দিন থেকে যখন সে তার বক্তব্য দিয়েছে তার শুরু থেকেই বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তার মস্তকের দাম ঘোষণা করেছে। প্রশ্নের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো তারা অতি মাত্রায় জাতীয়তাবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত। তাসলিমা প্যারিস থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতা অবস্থানের সময় বলেছে কলকাতা আমার দ্বিতীয় দেশ (2nd Home) একইভাবে বোম্বের

শিবসেনার সমস্যায় ইমরান খান বলেছে বোম্বে আমার অনেক পাকিস্তানী উত্তেজিত হয়েছে এবং আলোচনাও করেছে। এমন কি সুনীল গাভাস্কার যখন ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্সার হাসপাতালের কার্যক্রমের জন্য পাকিস্তান গেল তখন পত্রিকাতে গোলমালের অনেক খবর বের হয়েছিল। কেন গাভাস্কার সেখানে গেল এটা একটা সমস্যা বটে এবং সবই তো একই রকমের সমস্যা। কিন্তু আমি বলবো এমনটা বলার জন্য কোন প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হবে এবং তারা তাদের এ মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা চেয়েছে তাতে আমার ভিন্ন মত আছে।

প্রশ্ন ঃ ৭৪। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে ঃ তাসলিমা নাসরিন একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো, তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।' এ বিষয়ে আপনার কোন মতামত আছে কি? থাকলে কি মন্তব্য করবেন? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ হ্যাঁ আমিও একমত, যে তাসলিমা নাসরিন তার বিতর্কিত লেখায় উল্লেখ করেছে যে, কুরআন বলছে স্বামীদের জন্য স্ত্রীগণ হলো শস্যক্ষেত্র For husbands women are farmland" কুরআন Farmland বলেনি, কুরআন বলেছে 'Tilt' যদিও Farmland এবং Tilt এর অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তথাপি তাসলিমা কুরআনের সঠিক উদ্ধৃতি দেয়নি, সে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। তাসলিমা কুরআনের ভুল উদ্বৃতি দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে Tilt কিন্তু সে বলেছে Farmland. সে কুরআনের কথা বলেছে ঠিকই কিন্তু কোন রেফারেন্স দেয়নি। সে বলছে "For the husband the wife is the farmland, you can approach them as you like" অর্থাৎ স্বামীদের জন্য স্ত্রী হলো শস্যক্ষেত্র তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতে পার। সে আরো বলেছে "The women are considered as properties" অর্থাৎ নারীকে সম্পদ (Properties) হিসেবে বিবেচনা করা হয় সে কুরআনে যে উদ্ধৃতি দিয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের একটি। যদিও সে রেফারেন্স করেনি। এখানেও সে কুরআনের ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। সে কুরআন থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি দেয়নি। আংশিক উল্লেখ করেছে। কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে তা হলো–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থ ঃ "মানবকূলের নিকট প্রিয় করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয়

বস্তুসামগ্রী এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু, আল্লাহর নৈকট্যই হলো উত্তম আশ্রয়।"

কোরআন বলেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত গুণাবলীসম্পন্ন অশ্ব এবং শস্যক্ষেত্রসমূহের মালিক হলে কে না গর্বিত হয়? আপনিই বলেন ভাল স্তরের জন্য কোন ব্যক্তি আনন্দিত, গর্বিত হয় না, কুরআন নারীর কথা বলেছে, যেখানে স্ত্রী ও মেয়েকে বুঝায়। বলেন কোন পিতা তার সুপুত্রের জন্য গর্বিত হয় না? কোন স্বামী তার উত্তম স্ত্রীর জন্য গর্বিত হয় না? একইভাবে, কোন স্ত্রী তার উত্তম স্বামীর জন্য গর্বিত হয় না? এসব যদি ভাল হয় তাহলে অবশ্যই তার জন্য গর্ববোধ করাটা স্বাভাবিক। তাহলে কোরআন কেন তাদেরকে সম্পদ (Properties) হিসেবে গণ্য করবে না।

আপনার প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে বলছি – "কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।" সে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বলেনি যে, সে কুরআনের কোথায় এ আয়াত পেয়েছে পুরো কুরআনের কোথায় একথা বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীদেরকে পুরুষদের শস্যক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। সে (তাসলিমা) কুরআনের সূরা আল বাকারা এর ২২৩ নং আয়াতকে নির্দেশ করেছে। প্রকৃত অর্থ এবং উত্তর জানার জন্য আপনাকে এই আয়াতের পূর্ববর্তী ২২২ নং থেকে পড়তে হবে। তারপর আপনি ২২৩ নং আয়াতে আসবেন, ২২২নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থঃ "আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে হায়েজ (ঋতু) সম্পর্কে, বলে দাও তা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর, তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।"

আমি কুরআনের যে আয়াত বললাম তাতে Period চলাকালীন সময়ে স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মেডিকেল সাইন্স বলে যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর Period (ঋতু) চলাকালীন স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তা স্ত্রীর জন্য অনেক ক্ষতিকর

এবং পরবর্তীতে অনেক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো ডাক্তার আপনাকে এই একই কথা বলবে। এটা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর তেমনি স্বামীর জন্যও। সুতরাং কুরআন বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই নির্দেশ দিচ্ছে। যখন তোমাদের হায়েজ (ঋতু) চলে তখন তাদের সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ২২৩ নং আয়াত–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জ্ঞান রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"

কুরআন বলেছে তোমরা হায়েজ চলাকালীন তোমাদের শস্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী হয়ো না, তাছাড়া অন্য সময় তোমরা যখন চাও তার নিকটবর্তী হও, যদি তারাও তোমাদের কাছে আসে। এখানে সমস্যা বা ক্ষতি কোথায়? সে তো কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়েছে এবং কুরআন থেকে ভুল উদ্বৃতি দিয়েছে। যেমন– নারীদেরকে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনার বিষয়টিও। এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কিত, যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি নারী/স্ত্রী যদি ঋতুবর্তী হয় তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ো না। কুরআন বলছে, না তুমি স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়ো না, এটা স্বামী–স্ত্রী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

সমাপ্ত